Mayurkonthi Bolkol

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

ময়ূরকণ্ঠী বল্কল

গার্গী ভট্টাচার্য

সৌম্যর স্নেহছায়ায় রচিত এই গ্রন্থ

আমার বোন 'পপনুর জন্য' (অনন্যা মিত্র)

যার সাথে কৈশোরে চিঠির আদান প্রদান দিয়ে আমার লেখালেখি শুরু .....

ময়ূরকন্ঠী বল্কল

ময়ূরকন্ঠী বল্কলে ঘুঙুর বাজে। পাহাড়ি এলাকা -নাম কোহরা , মেঘে ঢাকা পথ। ছোট্ট বসতি। মেঘের পরে মেঘ ঢেকে রেখেছে একটি বড়সড় আদিম গুহাকে। কুয়াশা ওড়নায় মোড়া লাজনম্রা লতাপাতা। সবুজাভা। সামনে পাতাঝরা , হলুদ রংয়ের সরু, ভিজে একটি রাস্তা।

পাহাড়ে উঠে, গুহার মুখে এসে পাতা সরিয়ে ঢুকে যেতে হয় । কাছেই আছে ময়ূরাক্ষী নদী। আমাদের ভারতের নদী নয় , এই জলস্রোত একটি রহস্যময় স্বপ্নঝোরা। তরলিত কুহেলি।

শায়েরী , লহরী , ময়ূরী ও পার্ল- চারজন এসেছে এই গুহায় প্রবেশের ইচ্ছায়। কিন্তু ইচ্ছে হলেই হয় না। এখানে এসে পার্ল ওর গলায় সারমেয়র মতন ডাকে। ডাকলে একটি সাদা লোমশ কুকুর কোথা থেকে ছুট্টে এসে পার্লকে নিয়ে যায় গুহার ভেতরে। নিত্য নতুন পথে নিয়ে যায়, পুরনো পথ বনভূমে হারিয়ে যায়। আগের পথে গেলে গোলকধাঁধা মনে হয়। কুকুরের নাম কেশরী। একটু যেন কেশর আছে , শ্বেতশুভ্র দেহে তার।

গুহায় এক বুড়ি থাকে। তার নাম সিংহিকা । খুব বুড়ো মানুষ। থুরথুরে , পাকা চুল শণের মতন। তার নাকি অনেক বয়স। হাজারের ওপরে। লোকে বলে। পার্ল ওকে প্রথম দেখে নদীর

পাড়ে । শণের মতন চুল খুলে স্নান করছে । পার্লকে দেখে কাছে ডাকে হাতের ঈশারায় । তারপর নানান কথার পরে ওকে গুহায় নিয়ে যায় । ওকে নাকি বুড়ির ভীষণ ভালোলেগেছে । একা থাকে ঐ গুহায় । ভেতরটা হালকা সবুজ ও খয়েরি পাথরে তৈরি । প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট । মনে হয় যেন স্ফটিকের প্রাসাদ , যেখানে নিজের কথা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে । কিছু কিছু পাথর তো রীতিমতন জলে ভাসে !

বুড়ি নাকি কুব্জা মন্থরা । রামায়নের সেই বিশেষ চরিত্র । যার জন্যে রামের বনবাস । কৈকেয়ী সহচরী মন্থরা সেইসময় অনেক খারাপ পরামর্শ দিয়ে দশরথ ও রামের নানা অনিষ্ট করেছিল । এখন আত্মগ্লানি হয় । মনে হয় যা হয়েছে তা ঠিক নয় । কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে অনেক । তাই নতুন কিছু করার অবকাশ নেই । পৃথিবীও অনেক বদলে গেছে । কাজেই এই যুগে এসেই কিছু করে দেখাতে হবে যাতে মানুষের ভালো হয় । ধরিত্রীপুত্রদের মঙ্গল হয় । তাই মন্থরা ওরফে সিংহিকা নাম্নী এই পক্ককেশী , লোলচর্ম বৃদ্ধা স্থির করেছে যে এই গুহায় সুরক্ষিত একটি জীবাশ্ম দিয়ে মানুষের উপকারে ব্রতী হবে ।

এই ফসিলটি, মন্ত্রবলে হয়ে যায় একখানি বল্কল । সেই বল্কলের রং ময়ূরকন্ঠী । ময়ূরের গায়ের রং বিচ্ছুরিত হয় বল্কল থেকে ।

সেই রংসাগর ভেদ করে বল্কল এর নির্যাস দেয় একবার পেট্রল ও অন্যবার এক স্নিগ্ধ রশ্মি যা সমস্ত জীবজগতের তেজস্ক্রিয়তা ও দূষণ শুষে নেয় ।

এমনিতে ফসিল শান্তি বিকিরণ করে । ওর কাছে নত হলে শান্তিতে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় । এই গুহায় কেউ কাউকে কারো কাজের জন্য বা অন্যকিছুর জন্য বিচার করেনা । কেউ বিচারক নয় শুধু দর্শক ও শ্রোতা । ফসিল থেকে অনবরত ঘুঙুরের সুর , ধ্বনিত হয় ।

ফসিলের বল্কলে রূপান্তর সহজ নয় । ভদ্রিকা ও ভ্রামরি নাম্নী দুই রূপসী এই গুহায় আছে । তারা রামায়নের চরিত্র কিনা পার্ল জানেনা । তারাই জীবাশ্মকে রক্ষা করছে ।

সেই দুই মেয়ে একবার করে এসে এক একটি কাহিনী শোনায় এই মাটি , মোহর , হিমঝরা পাহাড় ও সোনাঝরা ক্ষেতের । আকরিক মানুষের , সবুজ ঘাসের ঘ্রাণের ও শিশিরের প্লাবণভূমের ।

যার সবচেয়ে বেশি গল্প মানুষের মন ছুঁতে পারবে তার জন্য ফসিল একবার মাত্র বল্কল হবে । সেই সময় হয় সে দেবে পেট্রল অথবা রশ্মি । ভদ্রিকা পাবে পেট্রল আর ভ্রামরি পাবে রশ্মি । দুটো একসাথে হবেনা । যদি ড্র হয় তাহলে কী হবে বিচার করবেন পাঠক ।

এই অভিনব খেলা দেখতে এসেছে ওরা চারজন । পার্ল যার মধ্যমণি ।

প্রথম গল্প এক পাদ্রীকে নিয়ে । যিনি একটি আশ্চর্য চরিত্র । গল্প বলতে শুরু করলো ভদ্রিকা :

পাদ্রী সাহেব

রব ও ডেজি জনসন থাকেন বিদেশে । মাসকয়েকের ছুটিতে গেছেন শ্রীলংকায় বেড়াতে ।

সুন্দর সবুজ , সতেজ চা বাগানে আছেন । পাহাড়ের মাথায় চা বাগিচা । ছোট ছোট কুটির । সেখানে থাকছেন । খুব ভালো লাগছে । বাগানে গিয়ে বড় বড় পাতার চা পান করছেন । ছুটে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক । ফেরার আগে একটু গোলমাল হয়ে গেলো । ওরা আগে বলেন নি । পেমেন্ট নেবার আগে বললেন যে ট্র্যাভেলার্স চেক নেবেন না ।ক্যাশ দিতে হবে ।

বিপদে পড়লেন দম্পতি । তখন ওরা গাড়ি ভাড়া করে তিন ঘন্টা দূরে এক ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলে আনেন । রব রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করেন । ডেজি কাজে সাহায্য করেন ।

পয়সাকড়ি ভালই আছে ওদের । মোটামুটি ধনী ।

অনেক বাড়ি বেচেছেন । বেশির ভাগ ক্রেতা র‍্যাশেনাল । অনেকে আবার একটু খুঁত খুঁতে ।

কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলে সেই বাড়ি কেনেন না । তাতে নাকি মালিকের শুভ হয়না ।

রব এসব মধ্যযুগীয় তথ্যে বিশ্বাসী নাহলেও ক্রেতার মন রাখতে নানান ব্যাবস্থা করেন , খ্রীস্টধর্ম মতে নানান সার্ভিস ।

নারিকেল ও চালের নানান সুখাদ্য ভক্ষণ করে একটি গাড়ি নিয়ে ওরা গেলেন । পাহাড়ি কুয়াশা কেটে ধেয়ে চলে জান্তব গাড়ি । সুন্দর পথে । বেশ কিছু দূর যাবার পরে গাড়ি পথ হারিয়ে ফেলে । সারথী নাকি এই রাস্তায় নতুন । কাজেও নতুন ঢুকেছে । কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়িয়া সবুজে হারিয়ে যায় ওরা ।

এমন সময় এক পাদ্রী সাহেবের দেখা মেলে । জোব্বা পরা , কালো মোটা ফ্রেমের চশমা ।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছেন ।

--দাঁড়াও ওহে পথিকবর !

গাড়িটা থামিয়ে নেমে আসেন রব ও চালক । পাদ্রীসাহেব ইংলিশে জানতে চান একটু লিফ্ট মিলবে কিনা । উনি শহরে যাবেন । রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন ।

ওরা তো মেঘ না চাইতেই জল পেলেন ।

পাদ্রীসাহেবকে তুলে নিয়ে আবার গাড়ি ধেয়ে চলে ।

- উহ্ ! কি মারাত্মক কুয়াশা , মেয়েদের সাদা ঘোমটার মতন-বলে ওঠেন উনি ।
- হ্যাঁ , মৃদু জবাব চালকের । চালকের পাশেই বসে উনি ।
- পেছন থেকে রব জানতে চান : আপনি কোথায় থাকেন ? এই পথে একা কেন ?
- আমি একটু দূরে একটি গীর্জায় আছি । আসলে ভেবেছিলাম কিছুটা হেঁটে নিই তারপরে কোনো গাড়ি দেখলে উঠে

পড়বো । এই পথে তো গাড়ি চলেই আর লিফ্‌ট নেওয়াও খুব কমন ।

এলোমেলো , আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ, একমনে চলেছে ছায়ামানুষ , নি:সঙ্গ মহীরুহের বুক চিরে । কথায় কথায় অনেকটা সময় কেটে গেলো । পাদ্রী সাহেব পেছনদিকে মুখ ঘুরিয়ে রব ও ডেজির সাথে কথা বলে চলেছেন । স্থানীয় নানান তথ্য দিচ্ছেন । চা বাগানের ইতিহাস । লোকাল নানান গল্প ।
এইসব গল্পগাথায় প্রায় শহর এসে গেলো । শহরের মুখে উনি নেমে গেলেন । ওরা আরো ভেতরে যাবেন ।
পাদ্রী সাহেব ওদের সঙ্গে চা পানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে ডেজি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান গল্পের আশায় । উনি খুব গল্প করতে ভালোবাসেন ।

ওরা সবাই নেমে একটি রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করেন । কাঠের ভারী চেয়ার । নিচু টেবিল।কৃষ্ণভামিনীর কালো হরিণ চোখের আহবান ! চা ও টা খেতে খেতে কথা ।

পাদ্রীসাহেবের বিচিত্র জীবনের গল্প শুনলো ওরা ।
আদতে বাঙালী এই মানুষটি নকশাল ছিলেন । কলেজের মেধাবী ছাত্র । সারাজীবন ফার্স্ট হয়ে এসেছেন । শেষে নকশাল করেন । পরে পালিয়ে যান জাহাজে করে বিদেশে ।
সেই দেশ এক সুন্দর অরণ্যের দেশ । সাদা মানুষ , কালো মানুষ । আর কোনো মানুষ নেই । না হলুদ, না বাদামী ---
পাদ্রীসাহেবই একমাত্র বাদামী মানুষ ওখানে ।

একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভার নিলেন যার মালিক ঐদেশের মুকুটবিহীন রাজা ।
অনাথ শিশুদের স্কুল । ওদেশে বিবাহের পূর্বে সন্তান হওয়া সমাজে স্বীকৃত নয় অথচ প্রি -ম্যারাইটাল ও এক্সট্রা ম্যারাইটাল সেক্সে বহুমানুষই লিপ্ত । অসহায় শিশুদের স্থান অনাথালয় । ওখানেই ওরা বেড়ে ওঠে সমাজের প্রতি এক দু:সহ ঘৃণা নিয়ে । কে ওদের বাবা কে ওদের মা ওরা জানে না।জানতে কী চায়? আদৌ ?

পাদ্রীসাহেবের নাম ছিলো কমল সান্যাল । ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও ছিলেন নাস্তিক । ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানতেন না । মনবল ছিলো প্রবল । অন্যায়ের প্রতিবাদ করা , গরম রক্ত ফুটতো তাই মারামারিও হয়ে যেতো কখনো সখনো ।

এহেন কমল একদিন জানতে পারলেন যে এই অনাথ আবাসনের আড়ালে রাজা উজিরেরা শিশুগুলিকে পাচার করে ভিন্ন দেশে । ওদের গায়ে লেবেল লাগিয়ে নানান পণ্যদ্রব্যের মতন বাজারে বিক্রী করা হয় । এইসব বাজার বসে গভীর রাতে ।

কমল মাস্টার ওদের খুব প্রিয় । মাথায় , গালে হাত বুলিয়ে দেন অসহায় শিশুগুলির যেন উনি ওদের পালক নন , পিতা । ওরা স্নেহধন্য । কমল মাস্টারের তাই বুঝি কিছু করা দরকার । এক এক করে চালান হয়ে গেলো রাম, শ্যাম, যদুরা ।

আমাদের পাদ্রীসাহেব চোখ বুজে না থেকে প্রতিবাদ করেন ।
প্রতিবাদের সুর খুব চড়া । রাজা উজিরেরা জানান দিলেন যে উনি চাকর । মালিকের কাজের প্রতিবাদ করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে ।

চাকরি চলে গেলে খাবেন কি ? থাকবেন কোথায় ?
এক শুভাকাঙ্খী বললেন : মশাই সারা দুনিয়ায় তো কত অন্যায় হচ্ছে । কজনকে ধরবেন ? আর নিজে নকশাল করে তো দেখেছেন । দেশের কোনো সুবিধে হল ? বরং আপনাকেই পালাতে হল । এসব উপকারের ভূত মাথা থেকে তাড়ান ও কাজে মন দিন ।
বাচ্চাগুলি যেদিন অনাথ হয় সেদিনই ওদের কপালে নেমে আসে চরম দূর্ভোগের প্রথম পেরেক । এই তো ওদের ভাগ্য । আপনি কী আর বদলাবেন ?

কমল সান্যাল ভেবে দেখলেন , কথাটি কতকটি সঠিকই ।

চুপ করেই ছিলেন । কিন্তু আর পারলেন না । যেদিন জানতে পারলেন যে মানুষের দেহের **ক্যান্সার** কেটে অর্থাৎ টিউমার কেটে যে হাসপাতালগুলি ফেলে দেয় , সেই বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট তুলে এনে এইসব বাচ্চাদের মাংস রান্না করে খাওয়ানো হয় । রবিবার ছুটির দিন মহাভোজ ।
ক্যান্সারের কাবাব ভক্ষণের দিন সেটা ।

নকশাল কমল কুমার হাতে অস্ত্র তুলে নেন । পর পর গুলি করে মারেন মোট ১৭ জনকে । এক রাতে । বন্দুক চালনাতে তুখোড় ছিলেনই । চোরাবাজার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন । পুলিশ কেস হয় তবে সব জানাজানি হয় কিনা উনি জানেন না । কারণ ততদিনে উনি পলাতক । এখানে পালিয়ে আসেন ।

শ্রীলংকার এই গহীন পাহাড়ের ওপর এক গীর্জায় এসে কর্মরত পাদ্রীর কাছে নিজ দোষ স্বীকার করেন । বৃদ্ধ সেই পাদ্রীসাহেব ফাদার হ্যারী স্যাকো বলেন: তুমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছো ।

একে হনন না বলে বলো শাস্তি । মন হাল্কা হয়ে যাবে । উইকেড মাইন্ড এইসব কনফিউশান সৃষ্টি করে । চিন্তায় স্বচ্ছতা আনো ।
কনফেশনের পরে ফাদার হ্যারী ওকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন । নাস্তিক কমল সান্যাল হন পাদ্রীসাহেব । ফাদার অগাস্টিন ।
লোলচর্ম , সাদাচুলের এই বৃদ্ধের কাছে একনাগাড়ে তার জীবনের এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে রব ও ডেজি অল্প হাসেন । ওঁর আত্মশুদ্ধির এই অভিনব রাস্তা দেখে ওরা কিঞ্চিৎ অবাকও হন । এতগুলি খুনের দায় থেকে ওঁকে মুক্ত করেন ফাদার হ্যারী স্যাকো কেবল কিছু ধর্মীয় পাঠ দিয়ে ।
চা ও টা পান শেষে দুজনে পাদ্রীসাহেব কে বিদায় জানান । উনি ধন্যবাদ জানান ও বলেন যে ওদের দুজনের সাহচর্য ওঁর খুবই ভালোলেগেছে । সময়টা ভালো কেটেছে খুব । সবসময় তো যাত্রীদের সাথে এত সখ্যতা হয়না । মনের মিল হওয়া , থট্ ওয়েভস্ মেলা তো হয়না সচরাচর ।
যুবক চালকের কাঁধ চাপড়িয়ে দেন , বলেন : ওর হাতেই তো প্রাণটা সঁপে দিয়ে বসে ছিলাম কুয়াশা পথে !
চালক , সীসার মতন কালো ছেলে গুণশেখরণ হেসে ওঠে , হাতীর দাঁতের মতন দন্ত পাটি বিকশিত করে ।
এরপরে যে যার গন্তব্যে ।
ওরাও ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরে গোধূলিতে সেই চা বাগানের কুটিরে । সমস্ত বিল শোধ করে তল্পিতল্পা নিয়ে আবার যেতে হবে, এবার বিমান বন্দরের দিকে ।

যাবার আগে যথারীতি কথায় কথায় পাদ্রীর কথা হয় ।
বাগানের মালিক একটু অবাক হন । বলেন : এই অঞ্চলে গীর্জা একটাই । পাদ্রীও আছেন । নামও একই । আগে কমল সানিয়াল ছিলেন । এখন ফাদার অগাস্টিন ।

পূর্বের বৃদ্ধ ফাদারের কাছে দীক্ষিত হয়ে এখন গীর্জার ভার সামলান। গুড ফ্রাইডে, যিশু দিবসের সব ভার সামলান দক্ষ হাতে । আগে এথিস্ট ছিলেন । তবে উনি খুব বুড়ো মানুষ । বাইরে কোথাও যাননা । আর পায়ে ব্যাথা, চোখেও খুব অল্প দেখেন । অতদূরে যাওয়া ওঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ।

ডেজি ও রব ভৌতিক কিছু আশা করেনি কারণ ফাদার জলজ্যান্ত ওদের সামনে ছিলেন । চা পান করেছেন ।

মালিক যেন কিছুটা আঁচ করেই বলে ওঠেন : উনি একটি বিশেষ বিদ্যা জানেন । যাকে পন্ডিতেরা নাম দিয়েছেন বায়োলোকেশান । উনি একই সঙ্গে দুই জায়গায় অবস্থান করতে সক্ষম । এটা উনি করেন ওঁর এনার্জি বডিকে কাজে লাগিয়ে । অনেকে আবার বলেন : চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে ।

আমি অতশত জানিনা । শুধু শুনেছি এরকম আরো অনেক মানুষ ওঁকে দেখেছেন নানান স্থানে । অথচ উনি কোথাও যাননি, আজ প্রায় ১০-১৫ বছর ।

সাধারণত: উনি যান কেউ বিপদে পড়লে । তবে দু একবার গুন্ডা বদমাইশ ওর হাতে ঘায়েল হয়েছে বলেও রিপোর্ট আছে ।

আধুনিক মানুষের সন্দেহপ্রবণ মন । সব কিছুর প্রমাণ চায় । গুগুলে সার্চ করেও বায়োলোকেশান সম্পর্কে বিশেষ কোনো বলিষ্ঠ তথ্য পেলেন না রব ও ডেজি ।

তবে এইটুকু জানা গেলো যে এরকম জিনিস সত্যি সত্যিই দুনিয়ায় ঘটে ।

সারা মহাবিশ্ব ভাইব্রেট করছে । আমরা বস্তু নই । কণার সমষ্টি । সেই সুক্ষ্ম কণার হেরফের ঘটিয়েই ফাদার আবির্ভূত হচ্ছেন একই সাথে দুটি স্থানে ।

যাঁরা বিজ্ঞানে বাঁচেন তাঁদের এই তথ্য দিয়ে চমকে দেবেন রব ও ডেজি। এইভেবে দুজনে হেসে ওঠেন , প্রাণখুলে, হাতে হাত রেখে ।

হয়ত সুদূরের কোনো নীহারিকায় ঠিক এইভাবেই হেসে উঠছেন অন্য কেউ,পৃথিবীতে একইসঙ্গে দুই জায়গায় থাকা যায়না , বায়োলোকেশান ওখানে মিথ এইসমস্ত বস্তাপচা তত্ত্ব শুনে।

এবার ভ্রামরির পালা । গলা ঝেড়ে রূপসী রহস্যময়ী ভ্রামরি শুরু করলো গল্প।

অ্যান্টিপ্পা

সবুজ সবুজ পাহাড়ের মাথায় একটি খয়েরি মড়া মহীরুহ । শুকনো, ডালপালাগুলি ইতিউতি ছড়ানো । যেন একটি লম্বা চওড়া মানুষ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে , একাকী ঐ পাহাড়ের চূড়ায় !

সত্যি সে মানুষই বটে । সকালে সূর্যের আভা মেখে উঠে পড়ে । ডালপালাগুলোয় হাড় মাংস এসে লাগে । কঙ্কাল থেকে মাংস যুক্ত একটি মানুষ হয়ে সে উঠে যায় সদর হাসপাতালের দিকে । আলিনগরের একটিমাত্র হাসপাতাল । যেখানে সে একজন মাত্র সাহেব অর্থাৎ গ্রীক চিকিৎসক । ডাঃ সিদ্ধার্থ জ্যাকসন অ্যান্টিপ্পা । সংক্ষেপে সিড অ্যান্টিপ্পা ।

বাবা ছিলেন বৌদ্ধ্য ধর্ম অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের ভক্ত । বলতেন : দুনিয়াই এই একটি ধর্মই শেষ অবধি টিঁকে থাকবে । অহিংসা প্রচারের কারণে ।

তাই হয়ত পুত্রের নামকরণ করেন সিদ্ধার্থ ।

পুত্র মেধাবী ছাত্র ছিলো । নিজের দেশে ডাক্তারি পড়তো । শেষে এক পত্রবন্ধুর প্রেমে পড়ে । আসলে নানান সংস্কৃতির আনাচে কানাচে ঘোরা সিড কৈশোর থেকেই পত্রবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতো নানান নতুন জিনিস জানার আগ্রহে ।

এরকমই এক মেয়ে কায়া তল্ওয়ার । মিষ্টি মেয়ে কায়ার প্রেমে পড়লো সিড্ ।

প্রেমপর্ব জমে উঠলো কিন্তু বাধ সাধলেন কায়ার বাবা । ছেলেটিকে দেখেন নি , চেনেন না বিয়ে হবে কিভাবে ?

দুপক্ষের মিলন হওয়া সোজা কথা নয় । দুজন দুজনকে ভালো করে জানবে তবে তো !

অ্যান্টিপ্পা ভিন্নধরণেরর মানবসন্তান । সোজা নিজ দেশ থেকে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে ভারতে । প্রেমের খাতিরে ।

মেয়েটির পাড়ায় ঘর ভাড়া করে উঠলো । কায়া ও তার পরিবারের লোকেরা ওকে যখন গ্রহণ করলো তখন আবার ভর্তি হল ডাক্তারিতে । এবং ভারতে ।

পরে চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করলো এই আলিনগরের হাসপাতালে । কারণ সাধারণ মানুষের ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন ।

পেশায় কার্ডিও থোরাসিক সার্জেন ডা:অ্যান্টিপ্পা ফুসফুসে লোবেকটমি , নিউমোনেকটোমি ও ওয়েজ রিসেকশান করার ফাঁকে ফাঁকে বাজাতেন অসাধারণ বেহালা ।

সেই সুত্রেই আলাপ রিক্সাচালক জহর মিঁয়ার স্ত্রী বেগমের সঙ্গে ।

জহর মিঁয়ার বাসা পাহাড়ের বস্তিতে । পাহাড়ের ঢালে বস্তি । সার দিয়ে ঘর । জহর শহরে রিক্সা চালায় । রিক্সা মানে অটো রিক্সা । বাড়িতে বেগম ও তিন পোলাপান । বেগম সেলাই ফোঁড়াই করে । রাস্তার ধারে দোকানে বিক্রি করে । দোকানী এসে নিয়ে যায় । সোয়েটার বুনে দেয় । নানান নক্সা কাটা , রং বেরংয়ের । অপূর্ব

সব কারুকার্য । এক বস্তিবাসিনীর হস্তে এত সূচীশিল্প, মনে মনে এত চারুকলা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত । আর এখন তো বেগম বেহালাও বাজায় । ডা: সাহেব ওকে শিখিয়েছেন । ওর নিজ গানের দল আছে । তারা নানান শহরে গিয়ে গান বাজনা করে ।

সেখানে এখন একজন বেহালা বাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে রিক্সাওয়ালার বধূ- বেগম ।

- তোমার নামটি ভারি সুন্দর তাই না ? বেগম ? দা কুইন- বলেছিলো ডা:অ্যান্টিপ্পা ।

কুইনের অর্থাৎ রিক্সাচালকের বধূর অসম্ভব মনের জোর । সেই ডা:অ্যান্টিপ্পার কারণে । নাহলে লাং ক্যানসার ধরা পড়ার পরে ভারি ভেঙে পড়েছিলো ওরা দুজন । পতিপত্নী ।

--ক্যানসার শুনলেই মনে হয় আর বাঁচবে না । কিন্তু অনেক ক্যানসার রুগী ত্রিশ- চল্লিশ বছরও বেঁচে থাকেন রোগ ধরা পড়ার পর । শুনেছিলো চিকিৎসকের কাছে । যেমন থায়রয়েড এর ক্যানসারকে বলা হয় গুড ক্যানসার । রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন দিয়ে চিকিৎসা করে সারিয়েই ফেলা যায় । এরকম নয় যে থায়রয়েড গ্ল্যান্ডে কারো ক্যানসার হলে সে কম কষ্ট পাবে, আমি বলতে চাইছি যে তাকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে। প্রায় সুস্থ জীবনই কাটাতে পারবে। আবার ব্রেস্টের ডাক্‌টাল কারসিনোমা ইন সিটু অথবা লবুলার কারসিনোমা ইন সিটু সাধারণত স্প্রেড করেনা । অপারেশান করে সারানো যায় । কারসিনয়েড টিউমার খুব স্লো-গ্রোয়িং ,এদের তাই বলে :ক্যান্‌সার ইন স্লো মোশান! ঠিক চিকিৎসা হলে সারানো যায় । অনেক ডাক্তার এখনও মনে

করে এরা বিনাইন টিউমার । কিন্তু আদতে এরা মেটাস্‌টেসাইজ করতে, অর্থাৎ দেহে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম ।

--সবই খোদাতাল্লার ইচ্ছে ,বলে ওঠে পান্ডিত্যের স্পর্শ বঞ্চিত জহর মিঁয়া ।

আসলে অ্যান্টিপ্পা যেই হাসপাতালে কাজ করে সেটা মেডিক্যাল কলেজও । সেখানে অনেক চিকিৎসক কাজ করেন ও পড়ান । এখানে একটি অলিখিত নিয়ম আছে যে কোনো চিকিৎসক যদি কোনো মহিলা চিকিৎসকের সাথে রাত্রিবাসের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন তাহলে সেই মহিলা চিকিৎসক বিবাহিতা অথবা কুমারী যাই হোন না কেন রাজি হয়ে যান । তা নাহলে তার ক্যারিয়ার পুরো নষ্ট করে দেওয়া হয় । এই অলিখিত নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছে । কেউ প্রতিবাদ করেন না । একবার বাইরে থেকে আসা এক মহিলা চিকিৎসক কোর্টে কেস করে দেন । কেসে জিতেও যান কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোথাও চাকরি পাননি । প্রাইভেট প্র্যাকটিশেও লোক হতনা । কেন কেউ জানেনা । শেষে উনি অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়েন ।

ট্রিটমেন্ট রেসিস্টেন্ট ডিপ্রেশান বা refractory depression এর কবলে পড়ে কোনো ওষুধে কাজ না হওয়াতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ।

ডাক্তার অ্যান্টিপ্পা এইসব ছাইপাশে নেই । কেবল রুগী দেখা , তার কল্যাণে প্রাণপণ লড়াই ও কোমল মনের পরশে নিঃস্তেজ রুগীর প্রাণসঞ্চার করা এগুলিতেই উনি সিদ্ধহস্ত ।

ওকে সবাই শ্রদ্ধা করে । চিকিৎসকের কাজ রুগীর রোগ সারানো ও অসুখ বিসুখ থেকে তাকে দূরে রাখা । হাসপাতালকে রান্ডিখানায় বদল করা নয় । তরুণী চিকিৎসকেরা সিনিয়র চিকিৎসকের কাছে ছাত্রীর সমান । ভারতীয় সভ্যতা এরকমই শেখায় । কিন্তু বাস্তব আর গুরুগম্ভীর কালচার আজ পৃথক হয়ে গেছে । কালচার থাকে পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ আর বাস্তব চলে সেক্স ও টাকার স্রোতে দুলে দুলে ।

বেগমের লাং ক্যানসার ধরা পড়ার পরে ওর বস্তিতে লোকে ওদের একঘরে করে দেয় । ওর নি:শ্বাসে নাকি বিষ আছে । নাহলে যে কোনো দিন সিগারেট পান করেনি তার কি করে এই রোগ হয় ? আজ সেই বিষের কবলে পড়ে পুরো বস্তি উজাড় হয়ে যাবে ।

এইভাবে ক্রমাগত বড় অসুখ এর চাপ ও পড়শীদের মানসিক অত্যাচারে অত্যন্ত কাহিল বেগমের মনে বল যোগায় অ্যান্টিপ্পা । বলে : এই রোগ যে কারো হতে পারে । আজ তুমি এই শয্যায় শুয়ে কাল আমিও এখানে শুয়ে থাকতে পারি যদি আমার ক্যানসার অ্যান্টিজেন টেস্ট পজিটিভ আসে ! আর আজকাল নন স্মোকারদের মধ্যেও লাং ক্যানসার বেড়ে গেছে । কিছু কিছু লাং ক্যানসার ওদেরই হয় আর তা স্মোকারদের থেকে চরিত্রগতভাবে ভিন্ন । অ্যাসবেসটস যা কিনা তোমার বাড়ির ছাদে আছে তা লাং ক্যানসারের উৎস । এছাড়া তোমার রান্নার সময় কড়াই এর ধোঁয়া থেকে বার হওয়া সুক্ষ্ম ক্যানসারের উৎসকণা দেহে জমা হতে পারে ।

বেগম অতশত কিছু বোঝেনা । তবে চিকিৎসক সাহেব খুব সহজ ভাবে সব বুঝিয়ে দিয়েছে । বলেছে ভয়ের কিছু নেই । সাধারণতঃ ক্যানসার ফিরে না এলে ও আরো পাঁচ ছয় বছর দিব্যি বেঁচে বর্তে থাকবে । অনেক রুগী আরো বহুদিন বেঁচে থাকেন । কাজেই ক্যানসার মানেই শেষ ঘন্টা নয় এখন ওষুধ পথ্যি এত উন্নত হয়ে গেছে । রোজই নতুন নতুন ওষুধ ও টেস্ট বার হচ্ছে ।

সিটি স্ক্যান , পেট স্ক্যান , কেমো থেরাপি ও রেডিয়েশান থেরাপি করে করে যদিও আজ সুস্থ বেগম কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করে মাঝে মাঝে , আবার যদি ক্যানসার ফিরে আসে! আজ সে বেহালা বাজায় , বেশ ভালো হাত তার অ্যান্টিপ্পা বলেছে । ওকে নিয়ে ডাক্তার বড়াই করে । একটি ফুসফুস ওর নেই ,বাদ দিতে হয়েছে । কিন্তু সেখানে সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা ভরে দিয়েছে এই সার্জেন যে নিজে একজন সুরেলা মিউজিশিয়ান । সার্জারির সময় সুরের হিল্লোল তোলে পাঁজরে।বিঁধে থাকেনা একটিও বিষাক্ত তীর আর ।

রিক্সাওয়ালার বধূ,-নাম যার বেগম সে আজ একজন সুরের কারবারি । এই পুষ্প চয়ন করেছে সুরের জাদুকর , ছন্দের সম্রাট ডাক্তার সিড্ জ্যাকসন অ্যান্টিপ্পা ।

সিড সারাদিন হাসপাতালে থাকে । বিকেলে যখন সূর্য, আকাশে লালিমা ছড়িয়ে হারিয়ে যায় মহাকাশের কালো গহ্বরে তখন সে ফিরে আসে সবুজ পাহাড়ের মাথায় । আস্তে আস্তে তার মাংস খুবলে নেয় নিশাচর কোনো অস্তিত্ব । দেহের অর্গ্যানগুলো গলে যায় । কঙ্কাল দেহ গাছ হয়ে শুয়ে পড়ে । গগনে গগনে তখন কালো কুচকুচে দেয়া । তপন নেই শুধু তারাময় কিংবা তারাহীন

গহীন রাত্রি । এক কোণে হয়ত বা একফালি রূপালী চাঁদ আর তারই মাঝে হাত পা মেলে গাছ হয়ে বিশ্রাম নেয় ক্লান্ত সার্জেন ও মিউজিশিয়ান রক্ত মাংসহীন -অ্যান্টিপ্পা ।

আসলে ওর পরিবারের কেউ আর আজ নেই । ওরা সবাই স্কি করতে গিয়েছিলো বিদেশে । সেখানে ওর স্ত্রী কায়া ও দুই সন্তান নিহত হয় । তুষার ধ্বসে । তারপরেও চিকিৎসক বাড়িতেই থাকতো । মনের ব্যাথা ভুলে -কিন্তু শান্ডিল্য গুপ্ত নামক এক রুগী যে চেন স্মোকার ছিলো তার ক্যানসার ধরা পড়ার পরে অপারেশান করাতে আসে অ্যান্টিপ্পার কাছে । অপারেশানের উপায় ছিলো না তার । কারণ ঐ ক্যানসারে অপারেশান করে কোনো লাভ হয়না - অন্যান্য চিকিৎসার পাঁচ সপ্তাহ পরে মারা যায় । কেমো নিতে পারেনি আর ।

তার দুই দুধের শিশুর করুণ মুখ ও গৃহবধূ পত্নীর অসহায় চেহারা দেখার পরে কেন যেন সেই ঘটনা ভুলতে পারছে না ডাক্তার । তার হাতে মৃত্যু তো হয়নি , মারা গেছে অনেক পরে কিন্তু তবুও নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে কেন ? হয়ত তুষারধ্বসে মৃত পরিবারের শোক ও শান্ডিল্যের এইভাবে চলে যাবার জন্যে দু:খ মিলেমিশে একটি বৃহৎ আকার নিয়েছে ।

এত বেদনা বুকে নিয়ে ঘরে থাকা সম্ভব হয়নি তাই পাহাড়ে থাকে আজকাল । তবে দিনের বেলায় রুগীর কল্যাণে সদা সর্বদা হাসপাতালে হাজির । হাজির মিউজিক আসরেও । বেগম আজকাল মূল বাজিয়ে । বেহালা বাদক বেগম । বেগম বাহার । সূর্যের আভায় ডাক্তার --নিউমোনেকটমি, লোবেকটমি , ওয়েজ

রিসেকশান করে , রুগীর হাত ধরে , তাদের মনে সোনা আলো ভরে দেয় ।

আর সন্ধ্যা গাঢ় হলেই অ্যান্টিপ্পা সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় ।একাকী ।নিঃসঙ্গ । রাতপাখির সখা , বুনো পোকার বন্ধু জ্যাকসন অ্যান্টিপ্পা দুই হাত আকাশে মেলে কাকে যেন ডাকে-একমনে , মৌনমুখর। কাকে খোঁজে তার আঁখিপল্লব ? ক্রন্দন -ক্রন্দন !

কায়াহীন কায়া ও সন্তানদের নাকি শান্ডিল্যের মতন অসহায় ফুসফুসের বিষে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অসংখ্য প্রাণগুলিকে , যারা আজ হারিয়ে গিয়েও আছে , ভীষণভাবে বাস্তবে।ছায়ামানুষ হয়ে । শুধু আমাদের চোখ নেই তাদের দেখার ও করুণ ছায়াস্বরের ভাষা বোঝার ।

ভূমিকম্প

ধূলিসাৎ হয়ে গেছে কতনা নগর, বাড়ি, ঐতিহাসিক স্থান অকস্মাৎ এক ভূমিকম্পে ।

রাতের বেলায় নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে হতাহত হয়েছে বহু মানুষ । কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিলো রাংতা গুহ মজুমদার । এবার ফ্ল্যাশব্যাক---

ওর বাবা ও মা দুজনেই পলিটিশিয়ান । সারাদিন ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে থাকেন । মানুষের ভালো করার ব্রতে ব্রতী কিন্তু কজনের সত্যিকারের ভালো হয় তা ভাববার বিষয় । তবে ওরা মানুষকে সম্মান দেন ।

আপাত দৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয় ।

রাংতার স্কুল ইংলিশ মাধ্যম । সেখানে এক আয়া নেপালি । মনোরমা দিদি । সেই মহিলার এক বোনপো আনমোল । কলকাতায় এসেছে দার্জিলিং থেকে একটু ভালো করে বাঁচবে বলে ।

কাজ নিয়েছে একটি কাপড়ের মিলে । ছেলেটি খুব ফর্সা ও গঠণ মন্দ না ।

লেপা পোছা মুখ , দাঁড়ি গোঁফ নেই ।

চটপটে , স্বভাব চরিত্র ভালো । সৎ ।

ছেলেটি ওদের বাড়িতে আসতো ওকে স্কুল থেকে পৌঁছে দিতে ।

ধীরে ধীরে প্রেম ।

ক্লাস টেনে পড়তে বাড়ি থেকে পালালো রাংতা । টালিগঞ্জের এক বসতিতে । মনোরমা দিদি তখন দেশে । আনমোলের সাথে বিয়ে করবে রাংতা । তারপর নতুন ঘর , রঙীন স্বপ্ন ।

বয়স মাত্র ১৫ । চোখে আবীর , মনে প্রেম গগন , মেঘ বৃষ্টি ।

মানুষের ভালো করা ও সবাইকে সমান অধিকার দেবার জন্যে গলা ফাটানো বাবা ও মা এসে ওকে জোর করে নিয়ে গেলো বাড়িতে । ও বললো : তোমরা যে বলো সবাই সমান ? আনমোল তো মানুষ খুব ভালো ।

বাবা ও মা দুজনেই প্রায় এক বাক্যে বললেন যে শুধু মানুষ ভালো দিয়ে জীবন চলেনা । ওদের সংস্কৃতি আর আমাদের ভিন্ন । এই পৃথক কালচারের বোঝা বইতে রাংতা অক্ষম । কাজেই ওকে বাসায় ফিরতেই হবে নাহলে লোকলজ্জার ভয়ে ওর বাবা-মাকে সুইসাইড করার পথ বেছে নিতে হবে ।

--সিম্পেল ব্ল্যাকমেলিং ! বলেছিলো ওর বন্ধু তূর্য ।

কিন্তু রাংতা কীইবা করবে ? ও তো মাত্র ক্লাস টেনে পড়ে ।

এরপরে মনোরমা দিদি ও আনমোলকে আর কোনোদিন ও দেখেনি । নাহ্ স্কুলেও নয় ।

ওরা হয়ত কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলো ওর পাওয়ারফুল পিতামাতার ভয়ে ।

--মিঠি মিঠি বাত বলবো তুমার সাথে জিন্দেগী ভর ,বলতো আনমোল ।
কোথায় সে ? --- আনমোল , ও আনমোল !

আজ প্রায় পনেরো বছর পরে ওদের দেখলো এক পাহাড়ে । ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ সমস্ত । ভ্রমণার্থী অনেকেই ছিলো সরকারি শিবিরে । নিরাপদ আশ্রয়ে । মাঠের নিচে ।

সেখানেই দেখা বিবরের সাথে । বিবর সোসাল সায়েন্স নিয়ে পড়েছে । ইচ্ছে ছিলো সত্যিকারের কোনো সামাজিক কাজ করা সংগঠনে যোগ দেবে । কিন্তু সেরকম একটিও মনে ধরেনি । কাজেই আপাততঃ একটি কল সেন্টারে কাজ নিয়েছে ।

এখানে সে বেড়াতে এসেছিলো । রাংতারই মতন । রাংতা ওর নিজস্ব *এন জি ও*-র জন্যে একটি কর্মঠ ম্যানেজারের সন্ধানে ছিলো যে ভালোবেসে কাজ করবে কেবল মাস-মাইনের লোভে নয় । কিন্তু সেরকম মানুষ মেলা ভার । এ যেন মেঘ না চাইতেই জল ।

রাংতার এন জি ও এর নাম রাইকিশোরী । সেখানে ওরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার যেইসব মানুষ তাদের সহায়তা করে, ছাদ দেয় । ভরসা দেয় ।

-যার যেরকম কর্মফল তার সেরকম হবে , বলে পাশ কাটিয়ে যায়না ওরা।

রাংতার প্রাণ ভোমরা এই রাইকিশোরী । তাই এর ভার সে দিতে চায় এক কর্মঠ ও প্যাশনেট মানুষকে । আপাততঃ সেই এর ম্যানেজার ।
বিবর সেনগুপ্তকে পেয়ে ওর মন ভরে গেলো । ভূমিকম্প নাহলে এর সাথে দেখাও হতনা । কথা হল যে কলকাতায় ফিরে ও যোগাযোগ করবে ।

এরপরে রাংতা ও আরো কিছু মানুষকে হেলিকপ্টারে করে সরকারি মানুষ নিয়ে গেলো একটি অন্য পাহাড়ে । নীল পাহাড় । লাল মেঘ । সবুজ মানুষ ।
সেখানে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো যে আজ ওরা খুব লাকি । কারণ ওরা মানুষ দেখার জন্যে মুখিয়ে থাকে । কেউ আসেনা বাইরে থেকে । আজ ভূমিকম্পের কারণে অনেক মানুষ ওদের গৃহে ঠাঁই নিতে এসেছে ।খুবই যত্ন আত্তি করছে ওরা সকলকে ।
এখানেই আবার পনেরো বছর পরে মুখোমুখি হল আনমোলের ।
রাংতার মতনই ও অনেক বড় হয়ে গেছে ।

বৃদ্ধ বাবা ও মাকে নিয়ে থাকে । দু তিনটে ভাইবোন আছে তারা অন্যত্র বিয়ে শাদি করে চলে গেছে । এক বোন মৃতা । তার একটি ছোট ছেলেও ওদের সাথে থাকে ।
মনোরমা দিদি মারা গেছেন দুদিনের জ্বরে ।
কলকাতা থেকে ওরা একপ্রকার পালিয়ে আসে রাংতার বাবার চোখ রাঙানির ভয়ে । সাতদিনের মধ্যে শহরের বাইরে না গেলে প্রফেশনাল কিলারের ভয় দেখান উনি ।
নগদ কিছু টাকা দেন । তাই নিয়ে রাতের ট্রেনে ওরা পালিয়ে যায় ।
দার্জিলিং থেকে আনমোল ওর নিজগৃহ নেপালে চলে আসে মনোরমা দিদিকে ওখানে রেখে । মনোরমা দিদি তারই বছর খানেক

পরে দার্জিলিং শহরে মারা যান । ওখানে একটি বোর্ডিং স্কুলে কাজ নিয়েছিলেন উনি ।

আনমোলের বাবা ও মা খুবই বুড়ো তবে বেশ যত্নশীল । ওরা জানেন না যে রাংতা একসময় আনমোলের প্রেমিকা ছিলো । কত চিঠি লিখতো ওকে অশুদ্ধ হিন্দীতে ।
ফ্লায়িং কিস দিতো । নলবনে নৌকো বিহার । আনমোল খুব ফর্সা । রাংতা ঈষৎ শ্যামলা , গমের মতন রং তার , রাংতার ।
চুপিচুপি বলতো : এই আমাকে তোমার থেকে একটু রং ধার দেবে নাকি ?
আনমোল হাসতো । চোখের দুই পাশ কুঁচকে ।বলতো -রং চোর !

আজ ওর মা অনেক রান্না করলেন ।

নেপালি খানা, দারুণ সব খাদ্য দ্রব্য । যেমন রাতো-মোহন , আলু রায়ো , ভুটেকো ভাত , খাসিকো মাসু , শাগ মাসু -এইসব অথেন্টিক নেপালি খাবার খেয়ে যারপরনাই খুশি রাংতা । ওরা একটু আদা বেশি খায় । ঠান্ডার দেশ তো ।

আনমোল বিয়ে করেনি । রাংতাও ব্যস্ত এন জি ও নিয়ে ।
--বিয়ে করোনি কেন আনমোল ? জানতে চাওয়ায় সে নির্মল হেসে বলে : আমার মনে মনে বিয়ে হয়ে গেছে । একটি আলট্রা মড মেয়ের সাথে !

এই কদিনের ধকল যেন এক পলকে মুছে গেলো আনমোল ও তার পরিবারের নির্মল স্পর্শে । হয়ত ওরা তেমন ধনবান নন , রাংতার মতন বিশাল অট্টালিকার মালিক নন কিন্তু প্রাণের টান

আছে ওদের কুটিরে । পাহাড়ের কিনারায় এই কয়েকটি কামরার দোতলা বাড়িটিতে আছে এক পরিচ্ছন্নতা যা কেবল ধুলে কিংবা মুছলে হয় না। এ হল মনের পরিচ্ছন্নতা । হৃদয়ের উষ্ণতায় পাহাড়ি ঘর স্নিগ্ধ । পাহাড়ের ঢালে অনাদরে ফুটে থাকা অজস্র গোলাপের মধ্যে নিজেকে আজ পরিপূর্ণ ভাবে খুঁজে পেলো রাংতা । কৈশোরের প্রেম । দুই রাত মাত্র একসাথে থাকা ।

--পুরুষমানুষের সাথে থাকলে বাচ্চা হয় , কনডোম কিনে নিয়ে যা । আনমোল জানে কি করে কনডোম পরতে হয় ? বলেছিলো সাবধানি বান্ধবী মন্দিরা ।

রাংতা দুইরাত ধরে আনমোলকে কাছে পেয়েছিলো কিন্তু ওর তো বাচ্চা হয়নি ! সেটা ভালো না খারাপ ও জানেনা শুধু জানে সেরকম কিছু হলে আজ আর আনমোলের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হতনা ।

ওর পাহাড়ি কাঠিন্যে জারিত বাবা মায়ের কোমল পরশ থেকে নগর কন্যা বঞ্চিত থেকে যেতো চিরটাকাল । কে বলে কলকাতার সংস্কৃতি আর পাহাড়ের ভিন্ন ? সমস্ত সংস্কৃতি রচনা করে মানুষ । মান আর হুঁশ । অহংয়ের মুখোশটা সরিয়ে শুধু স্বচ্ছ চোখে জীবনটা দেখার ব্যাপার ।

রাংতা, হঠাৎ খুঁজে পাওয়া বিবর সেনগুপ্তকে মোবাইলে এস এম এস করে দিয়েছে যে ভূমিকম্পে ক্ষয় হওয়া সবকিছু সুস্থ সুন্দর হয়ে গেলে ও রাইকিশোরীর একটি ব্রাঞ্চ এখানেই খুলবে ।

বিবর হবে কলকাতার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আর রাংতা এখানে থাকবে স্বামীকে নিয়ে ।

হারিয়ে যাওয়া , ফিরে পাওয়া দুই রাতের আদুরে বর --

পাহাড়ি বসন্ত ও আদিম পুরুষ , নারীর দেহলতায় পৌরুষের

রসকলি আঁকা , মনে রঙ-ডুবি পুর্ণিমা ! জোছনা -স্ফুলিঙ্গ দুইপায়ে জড়িয়ে হেঁটে চলে পাহাড় থেকে পাহাড়ে, পাহাড়ি শিখরে ,আজও কনডোম না পরা অপাপবিদ্ধ আনমোল !

হেমছায়া

হেমছায়া একজন হিলার । ও কাউকে স্পর্শ করলেই তার বেশির ভাগ অসুখ সেরে যায় ।

এই ম্যাজিকাল পাওয়ার সম্পর্কে সে নিজেও ওয়াকিবহাল ছিলো না । একবার পাড়ার এক কিশোর এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয় । চিকিৎসক জবাব দিয়ে দেন । হেমছায়ার মাসির বন্ধু ছিলো ছেলেটির মা । মাসির সাথে ওকে দেখতে গিয়েই প্রথম স্পর্শ করেছিলো - খানিকটা অসতর্কতায় । সেরে ওঠে সে । হঠাৎ-ই ওর দেহ জুড়ে নামে সুর্যের উজ্জ্বল কিরণ ।চনমন করে উঠে বসে সে ।

পরে পাড়ার মুদির মেয়ে তারিকার গলগন্ড । স্পর্শ করতেই ম্যাজিকের মতন ভ্যানিশ । লোকের মুখে নাম ছড়িয়ে পড়ে । হেমের মা সরলা দেবী মেয়েকে দিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যেন মেয়ে এই বিদ্যা ব্যবহার না করে , কারণ অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল সমাজে অসুবিধে হবে । প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি হেমছায়া ।

অন্য অচেনা শহরে পাড়ি দেয় ওরা , বাবার রেলের কর্মসূত্রে । পরে নিজে সেখানে পুরাতন জমিদার বাড়ির প্রেসে কাজ নেয় । নিপুন কাজ তার । খুবই কর্মঠ । মালিকের স্নেহের পাত্রী । একদিন জমিদার বংশের এক ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি ধরা পড়ায় পুরো পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া । কিশোরটি দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে । চোখের সামনে এই রোগের থাবা বসানো দেখে মরমে মরে যায় হেম । নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারেনা ।

মানবিকতার খাতিরে ছেলেটিকে দেখার ভান করে ছুঁয়ে দেয় । এরপরে সে সম্পুর্ণ সেরে ওঠে । মায়ের আঁচল সরে যায় হেমছায়ার ওপর থেকে , প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে ।

হেম আবার লুকিয়ে পড়ে । এবার শহর কলকাতায় পাড়ি দেয় । সেখানে এক বড় প্রেসে কাজ নেয় । পরবর্তী কালে ওকে বিদেশে পাঠান কর্মকর্তারা নতুন কাজ শেখার জন্যে ।

নতুন ছাপার মেশিনে কাজ শিখে আসবে সে বিদেশ থেকে ।

ছাপা হবে স্বর্ণাক্ষরে , অযান্ত্রিক হবে যন্ত্র -সেখানে ফুটে উঠবে কোমল ফুল ।

বিদেশে কাজ করতো নিষ্ঠাভরে । বলা ভালো কাজ শিখতো । কাজেই অনেক সময় রাত জেগে কাজ করতো । এইরকম একদিন ওদের পুরাতন প্রতিষ্ঠানের জীর্ণ বিল্ডিং এর সুবিশাল কাঠের দরজার বড় তালায় অসুবিধে হওয়াতে ওদের তালা খোলার বিশেষজ্ঞ কে ডাকতে হয় ।

এই কোম্পানি ২৪/৭ কাজ করে । সেদিন একটু বেশি রাত হওয়াতে মালিক নিজেই আসেন । এক লেবানীজ মহিলা । নাম রিম । পেশায় লকস্মিথ ।

বেশকিছু যন্ত্রপাতি ঘুরিয়ে বড় পুরাতন তালা খুলতে সক্ষম হয় রিম ।

ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নিলো । নগদ ২০০ ডলার ।

গভীর রাতে আসায় চার্জ একটু বেশি হল । সাবধানী গলায় বললো : এত তালা না লাগানোতেই মঙ্গল । বিপদে পড়লে তালা খোলার সময় কোথায় পাবে ? এত তালা লাগিয়ো না । এখানে তো এত চুরি টুরি হয়না !

লকস্মিথের কাছে এহেন আর্তি শুনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল হেমছায়া । মেঘের ছায়ার মতন ঘন কালো কেশগুচ্ছে হাত ঘষে বললো : এই কথা তোমার মুখে ?

রিম উত্তর না দিয়ে জানতে চাইলো এত রাতে এখানে একাকিনী মহিলা কেন ? হেমছায়া জানালো নম্রভাবে যে সে এখানে প্রিন্টিং প্রেসের কাজ শিখতে এসেছে সুদূর ভারত থেকে ।

--ইন্ডিয়া ? বিস্ফোরিত নেত্রে প্রশ্ন করে রিম।
-ইয়েস ।
রিম বসে পড়ে পাশের চেয়ারে । তারপর সময় নিয়ে বলে : আমিও ওখানে ছিলাম বেশ কিছু মাস । আমি ফৈজাবাদে ছিলাম । বেগম আখতার , উমরাও জানের নাম শুনে ওখানে যাই । গান শিখতে । আগে আমি গাইয়ে ছিলাম । ভারতীয় রাগসঙ্গীতে তালিম নিতে যাই ওখানে এক ওস্তাদের কাছে । ওঁনার বয়স ছিলো ৬২। নিজ পরিবার ছিলো । আমাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন । বলেন : আমার গলা নাকি কোকিলের মতন ।
একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মনে হল । তারপর জিনিসপত্র নিয়ে দরজা অভিমুখে এগিয়ে গেলো রিম ।
পেছন পেছন হেমছায়া ।
মেন গেটের কাছে এসে কম্বিনেশান লক খুলে পথ করে দিলো হেম । রিম বার হতে হতে থেমে গেলো । পিছিয়ে এসে বললো :

ওস্তাদজীর সাথে আমার একটি পুত্র হয় । নাম দিই - খলিল । ইট ওয়াজ আ বিউটিফুল লাভ স্টোরি ।

বিবাহিত মানুষের সন্তানের জন্ম দিয়েছি বলে অনেকে ওঁকে ছেড়ে চলেও যায় । আমার সহপাঠিরা । ওঁর পদস্খলন হয়েছে মনে করে । আমিও এখানে চলে আসি । লেবাননে না ফিরে । এখানে আমার কিছু আত্মীয় ছিলো ওদের কাছে এসে উঠি । তারপর তালাচাবির কাজ শিখে কর্মজীবন আরম্ভ করি । কিন্তু জানো তো এই তালার কারণে কিছুদিন আগে আমার একমাত্র সন্তান , ওস্তাদজীর সংরাগকে আমি হারালাম । ও একটি টেররিস্ট গ্রুপে যোগ দেবে বলে মনস্থ করে । আমি ওকে বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে আমার যন্ত্রপাতির বিশাল শেডে আটকে রাখি তালা মেরে ।

কাজে চলে যাই । মনে করেছিলাম যে সন্ধ্যায় ফিরে ওকে নিয়ে বসবো । ওকে বোঝাবো যে ওর বাবা একজন গাইয়ে ছিলেন ও হাতে সেতার কিংবা তানপুরা নিক, বন্দুক নয় । গোলাপ নিক , অগ্নিশলাকা নয় ।

কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখি ও নেই । ও মৃত , ও মৃত---বলে হাউ হাউ করে কেঁদে মেঝেতে বসে পড়ে রিম ।হাতের ব্যাগ মাটিতে পড়ে যায় ।

ওকে শান্ত করতে সময় লাগলো । নিজের ঘরে এনে দু কাপ কফি বানিয়ে এগিয়ে দেয় হেমছায়া । মিহিস্বরে বলে : আগে একটু শান্ত হও তারপরে যেও ।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলে রিম : পুরোনো জেনেরেটর নাকি গ্যাসের মোটর থেকে নাকি কিসের থেকে জানিনা ঘরে জমে ছিলো বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড । তার প্রকোপে দীর্ঘক্ষণ থেকে ঝিমিয়ে পড়ে ও মারা যায় -কারণ ওর আবার হাঁপানির টানের ব্যামো ছিলো ।

ভেবেছিলাম আমার গুরু , ওস্তাদ তৈমুর আলি খাঁয়ের এই প্রদীপ আমার সারাজীবন ভালোবাসার মোমবাতি হয়েই থাকবে । ওকে আমি গাইয়ে তৈরি করবো ওর গুণী পিতার মতন কিন্তু ভাগ্যের লিখন খন্ডায় কে ?
তাই বলছি অযথা ঘরে বা অফিসে এত তালা লাগিয়ো না। মুক্ত বাতাস আসতে দাও । নীল আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে দাও সবাইকে । তালা মানে শেকল, আর শেকলের ওদিকেই মৃত্যু ! তালাগুলো ভেঙে দাও, ভেঙে দাও , চুরমার করে দাও---বলতে বলতে নিকষ কালো অন্ধকারে ব্যাগ নিয়ে ধেয়ে গেলো লেবানীজ মেয়ে রিম তার চিরতরে হারানো প্রেমের শেষ চিহ্নর ব্যাথা বুকে নিয়ে ।

হেমছায়া আবার তার ম্যাজিকাল পাওয়ার কাজে লাগাতে পারতো - একবার যদি সে রিমের ব্যাকইয়ার্ডে পৌঁছাতে পারতো সেই গোধুলিতে । বুকে তুলে নিতো তৈমুর ওস্তাদের সন্তান খলিলকে, রিমের ভালোবাসার চিরাগকে। হয়ত জীবিত হত কিশোরটি।যে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলো জিহাদের সৈন্য হিসেবে ।

এবার ম্যাজিক হলনা । সবসময় হয়না । হলনা আলোছায়ায় জাদুকাঠি বোলানো । মেঘ ও পাহাড়ের আড়ালে চির অন্ধকারে হারিয়ে গেলো খলিল আলি , খাঁ সাহেবের অনুরাগের কণায় স্পন্দিত - রিমের বাঁচাতে চাওয়া-পরশমণিটি ।

দাহ

পশ্চিম দেশের এক ছোট শহর সুসানল্যান্ড । সবুজ সবুজ শহর । কাছে পিঠে ঐতিহাসিক নানান স্থান বলে ট্যুরিস্ট আসে বহু । বিশেষ করে হেমন্তে । আশেপাশে পাতাঝরার অনুষ্ঠান পালিত হয় । পাতাঝরার গান , নাটক ও নাচে ভরে ওঠে চরাচর । লাল ও সোনালি ম্যাপেল পাতা , বেগুনি ও স্বর্ণালী ঝরে পড়া রাশি রাশি পুষ্পময় পথ দেখে চোখ ও মন জুড়ায় । সামনে আসবে শীত । বরফ । তাই আগে নেচেকুঁদে একটু নিজেদের শেঁকে নেওয়া । গরম চাটুতে ।

এইসময় অনেক মানুষ ঘুরতে আসেন ।

শহরের শেষপ্রান্তে মোটেল চালায় প্রমিত বসু । কলকাতার ছেলে ।

দাদার সুপারিশে এই দেশে আসা ও সেটেল হওয়া । নিঃসন্তান । বৌ কলকাতার মেয়ে বনশ্রী । প্রমিত ও অন্যরা ডাকে বনু বলে ।

বনু তুখোড় গান গায় ও ফেনোমেনাল শেফ। অসাধারণ তার রান্নার হাত । দেখতে কিছুটা পুরনো দিনের বলিউডি অভিনেত্রী সাধনার মতন । তবে চুল ওরকম নয় । চুল খুব লম্বা ও স্ট্রেট ।

প্রমিতের আগে আরেক বিয়ে ছিলো । যেমন অনেক ভারতীয় পুরুষই মেমসাহেবে মজে সেরকম প্রমিতও বিয়ে করে স্টেফানিকে । আদতে বেলজিয়ান মেয়ে । সোনালী গাত্রবর্ণ , সাগরনীল চোখ , লঞ্জারির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে উজ্জ্বল তনুলতা ও গভীর গোপন সমস্ত মিথ ,

নিষিদ্ধ ফল । সেরকমই মেয়ে সুরেলা স্টেফি । কাজ করতো একটি পাবে । সেখানে মেয়েরা উর্ধাঙ্গে শুধু ব্রা ও নিম্নাঙ্গে অতি খাটো ও সরু এক জাঙিয়া পরে । দুইপাশ থেকে পশ্চাৎদেশ দেখা যাচ্ছে । অর্ধনগ্ন যাকে বলে । পুরুষেরা যৌবনসুধা উপভোগ করে মদিরাপানের ফাঁকে ফাঁকে ।

এহেন মেয়ে স্টেফি বাঙালি বধূ রূপে কী মানায় ?

একদিন ওরকম সাজের সাথে শাঁখাপলা ও সিন্দুর পরে বেরোতে যাচ্ছিলো । প্রমিত হাঁ হাঁ করে ওঠে : তোমাকে কেমন কার্টুনের মতন দেখাচ্ছে ডার্লিং এগুলি পরে ! জাঙিয়ার সাথে এইসব পরে না কেউ !

চোখে অবাক হবার চিহ্ন ফুটে ওঠে স্টেফির !

বলে : কেন তোমার দেশে মেয়েরা জাঙিয়া পরে না ?

-পরবে না কেন তবে সেটা দেখা যায়না !

- কেন , ইনভিজিবেল কাপড়ের পরে নাকি !

-আরে বাবা না ,সে তুমি বুঝবে না।এখন এগুলো খুলে এসো দেখি !

প্রমিত এই বৌকে বেশিদিন টেঁকাতে পারেনি । ও যখন কাজে যেতো প্রমিত রান্না করে রাখতো , ঘরদোর পরিষ্কার করে ফিটফাট করে রাখতো ।

স্টেফি এসে খালি খেয়ে শুয়ে পড়তো ।

তারপর যেদিন প্রেগন্যান্ট হল সেদিন থেকে মুখ ভার । নিজেই গিয়ে অ্যাবর্ট করিয়ে আসে । শিশুর ঝামেলা নেবেনা। অসম্ভব কাঁদে আর ঘন্টায় ঘন্টায় ন্যাপি পাল্টানো এইসব জঘন্য কাজ সে করবে না--সেই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঝামেলা ।

তারপরে চলে গেলো । পরে বিচ্ছেদ । এরপরে প্রমিত বিয়ে করে আনে বনশ্রীকে । মেয়েটি খুব ভালো ।

সুন্দরী , শান্ত, ভদ্র । এই বৌকে নিয়ে শহরের শেষে এসে খোলে মোটেল যার নাম পাহাড়ি বিছে । বাঙালী নাম হলেও সাহেবেরা সুন্দর উচ্চারণ করে । প্রমিত বলে : আমরা কত ইংরেজি গিলেছে এবার ওরাও বাংলা গিলুক । শুধু ভারত আর চীন থেকে জিনিস বানিয়ে আনলেই হবে ? ভাষাশিক্ষাও জরুরি ।

এই পাহাড়ি বিছে মোটেল হলেও একটি সংলগ্ন খাবার দোকান আছে । সেখান নানাবিধ খাবারের সাথে হট মিল মেলে । মেক্সিকান কতনা লংকা হয় ।

আগে বনু ভাবতো বাঙালি ও দক্ষিণীরা খুব ঝাল খায় । আদতে তা নয় । মেক্সিকান কত যে জাতের লংকা হয় ! এক একটা অসম্ভব ঝাল , ব্রহ্মতালু জ্বলে যায় । ধানী লংকা কোথায় লাগে ?

বনশ্রী ওরফে বনু নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে নানান ফিউশান ডিশ বানায় । একটি খুব ঝাল ডিশ । হট মিল নামে বিকায় ।

পাহাড়ি বিছে নাম দিয়েছে, তা বিছের কামড়ের মতন জ্বালা করে ঐ ডিশ খেলে ।

তবে বেশ জনপ্রিয় ।এক সাহেব বলে যায়-তোমার এই ডিশ খেলে অ্যাসে শর্টসার্কিট হয়ে ফায়ার জ্বলে! মনে হয় লাভা বেরিয়ে আসবে ।

ওদের এক কাস্টমার ভারতের মানুষ । সেদিন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো । তার ছেলে বলে ওঠে হেসে : মানুষ এই ডিশ খেলে, গাধার কি প্রবলেম হতে পারে ?

বাবা বলে ওঠে : এই অ্যাস গাধা নয় রে গাধা ; এর মানে আমাদের ভাষায় পছু (পেছন) !

প্রমিত এমনিতে খুব ভদ্র । মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় সুরাটা একটু বেশি জমে গেলে বনু মার খায় । একদিন কাচের টেবিল ভেঙে দিয়েছিলো , সঙ্গে টিভি সেটও ! রাগ পরে গেলে চুমু খায় । আবার মারে । শেষদিকে নিয়ম করে চাবকাতো । সাঁঝ আসে চাবুক হাতে । রাত্রিগুলো নির্দয় । ঘোড়ায় চড়ে আসে বিশাল একটা চাবুক হাতে নিয়ে , বনুকে চাবকায় । উল্টেপাল্টে -ওর বিয়ে করা বর ।

চিকিৎসক বললো :ডিপ্রেসড্ ; বনু ওকে সন্তান দিতে পারেনি তাই !

বনশ্রী মনে মনে ভাবে :ওসব ছাইপাশ না খেলে ও ভালই তো থাকে !

এই মোটেলে কাজ করে একটি লোক নাম কেন্ট ,কেন্ট ফিলোসফার । তা দার্শনিকই বটে । করে ঘরদোর সাফ । কাস্টমার এলে ও চলে গেলে । অনেকের কাপড় কেচে দেয় । খাবার, ঘরে দিয়ে আসে । দিবারাত্রি এখানেই থাকে । আর থাকে একটি বামন । সলোমান । সেও কাজ করে তবে কাস্টমারের সামনে যায়না । হাইটের জন্য ।

ওরা বনশ্রীকে সান্ত্বনা দেয় । বলে : সাহেব তো ভালই থাকেন , কেবল মাঝে মাঝে রেগে যান নেশা চড়লে !

ইদানিং- ***সন্ধ্যায় নিয়ম করে চাবকানোর*** কাজটি দায়িত্ব সহকারে পালন করে প্রমিত । অনেক গেস্টকে বলেও ফেলেছে : বৌকে পিটিয়ে সিধে করবে ! এমন মারবে যেন ছালচামড়া উঠে যায় । তারপর বিছানায় ফেলে খুব করে সঙ্গম করবে । বৌ মানে কী ? তোমার পুরুষাঙ্গের গ্যারেজ ।

এসব আজেবাজে কথা শুরু করলেই কেন্ট ও সলোমান ওকে ভেতরে নিয়ে যায় । তখন একমাত্র সলোমান বাইরে যায় , কাস্টমারের সামনে । সলোমান অর্ফানেজ থেকে এসেছে । এখানেই থাকে । বলে : তোমরা তাড়িয়ে দিলে অন্যকোথাও চলে যাবো । আমি ভবঘুরে । যাযাবর । দুনিয়ায় কে-ই বা চিরদিন থাকে? যেন করুণ সুর ফুটে ওঠে কথাগুলির ব্যাকগ্রাউন্ডে ।

নিজের দু:খ ভুলতে স্থানীয় নাটকের দলে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে । বলে : সেই কয়েক ঘন্টা অন্য কেউ হয়ে আনন্দ পাই । নিজের দু:খ ও বেদনা , বেঁটে ও অনাথ হবার জন্য মনে থাকেনা ।

ও আবার মাঝে মাঝে মক্ জাজের কাজ করে । এদের কাজ উকিলের সামনে উঁচুতে বসে ওদের কেস শোনা ও বিচার করা । কোর্টে, সবার সামনে কেসের আগে উকিলেরা মক্ জাজের সামনে আসলে মহড়া দিয়ে নেয় । মন্দ কামায় না উচ্চাসনে বসা , বেঁটে মানুষ সলোমান ।

হঠাৎ করে মানুষের মুন্ডুচ্ছেদ শুরু হয়েছে । করছে নানা ধর্মের মানুষ । কাউকে এমনিই মারছে কেউ প্ল্যান করা হিংসার শিকার ।

পথেঘাটে , দোকানে বাজারে লোকে খুন হচ্ছেন । এরকমই এক সময় এক ছুটির দিনে হঠাৎ মুন্ডুচ্ছেদ হয় প্রমিতের । শপিং মলে গিয়েছিলো বাজার করতে । এমনিতে ফার্মার্স মার্কেট থেকে সবজি চালান হয়ে আসে ওদের মোটেলে । নিজেরাও সেখান থেকেই খায় । শপিং -মলে যাওয়া জামাকাপড় কেনার জন্য । ভারতে যাবার বাসনা ছিলো । তাই উপহার কিনতে বৌকে নিয়ে গিয়েছিলো । বনশ্রীর আবার কেনাকাটার খুব শখ । শপিং -মল টানে । ছুটিছাটার সময় পায়ে পায়ে চলেও যায় । এই শপিং-মলই কাল হল । প্রমিতের মুন্ডুহীন ধড়টা বুকে করে ফুটপাথে বসে পড়েছে বনু । হাউহাউ করে কাঁদছে !

সত্যি অশ্রু নদী বইছে নাকি কুম্ভীরাশ্রু ?

প্রতিসন্ধ্যায় নিয়ম মাফিক চাবুক খাওয়া এক অসহায় নারী স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে কাঁদবে নাকি অভিনয় করবে তা সে-ই জানে । সমাজ ঠিক করতে পারেনা ।

কেন্ট ও সলোমনই ভরসা । প্রমিতের চলে যাওয়ার পর ওরাই বনশ্রীকে সাহায্য করে মোটেল চালাতে --- পাহাড়ি বিছে । খরিদ্দার অনেক বেড়েছে প্রমিত মারা যাওয়াতে । সহানুভূতিতে । সরকারপক্ষ থেকেই বেশ কিছু টাকা দিয়েছে বনশ্রীকে । লোকে বলেছে : তোমার স্বামীকে তো ফিরিয়ে দিতে পারবো না । কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারি শুধু । যে যায় তাকে আর আনা যায়না কিন্তু কেউ চলে গেলে কিছু থেমে থাকে না । দা শো মাস্ট গো অন, পাহাড়ি বিছে মাস্ট সার্ভ পিওপেল , অনেস্টলি ।

হট ফুড রান্না করা বনশ্রীর মনের ভেতরটা কেউ দেখতে পায়নি । সেখানে শোক নেই আছে পরম শান্তি । প্রতিটি সূর্যাস্তের পরে আর চাবকাবে না কেউ ওকে ।

এর কিছু মাস পরে ও বিয়ে করে চাকর কেন্টকে । চাকর হলেও সে হাই স্কুল পাশ ও বিভিন্ন মেকানিকের কোর্স পাশ । বৌ মারা গেছে । একটি ছেলে আছে সে খুব বদমাইশ ।বাবার খবর নেয় না ।মদ খায় , ড্রাগস নেয় । অনেক সন্তানের জনক সে । প্রথম বাচ্চা হয় ১৭ বছর বয়সে । এখন ৩২ । সবকটি বাচ্চাই এর তার সাথে । বেহিসেবী শিশু। বলে : সেক্স আর ফান ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই ।

কেন্টের বয়স ভালই । বনশ্রীকে হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব দেয় এক ইস্টারের ছুটিতে ।

পূর্ণচন্দ্রের আলোয় উদ্ভাসিত চরাচর । কেন্ট প্রপোজ করে । বনু না করেনা । ভালোবাসার বয়স আর নেই । শুধু একটু শান্তি চায়

সঙ্গীর কাছে আর জানে কেন্টও ওর মতনই এক দুখী মানুষ , কাজেই সন্ধ্যার হাত ধরে আসবে না চাবুক।

কেন্ট সত্যি ফিলোসফার , বলে-বনের শ্রী অর্থাৎ বনশ্রী মানে ফুল , ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার। আর ফুল আদরের জিনিস ।পা দিয়ে পিষের ফেলার নয় কাজেই বনশ্রীর পাওনা মিঠেল পরশ, চাবুকের দাগ নয়। আমি সন্তান চাই না , দুহাত ভরে বনফুল চাই , তোমার সুস্থতা ও কল্যাণ চাই ।

বনপাহাড়ি

বনে থাকে কেশরী । নাহ্ এই কেশরী আমাদের গুহার সেই তেজি, বোদ্ধা সারমেয় নয় । এ এক মানবী --মাথায় রূপালি চুলের আভা , হাতে মোটা তামার বালা ।

আগে থাকতো সুদূরে। রঙ্গলি নামক গ্রামে , তা সে অনেক দূরে ।

এখন বনে থাকে । এক মেয়ে, নাম তার বিজলী ।

মেয়ে যখন খুব ছোট তখন ওকে নিয়ে পালিয়ে আসে অরণ্যে । অরণ্য কাউকে ফেলেনা । মানুষের আদি চারণভূমি তো অরণ্যেই ।

বিজলী ও কেশরীকে সাদরে গ্রহণ করে বনতল । বনমাতাল কেশরী তারপর থেকে এখানেই বসবাস করছে ।

ফলমূল খায় । কখনো কখনো রান্না করে মাটির উনুনে । আলু , বেগুন গ্রামের হাট থেকে কিনে পুড়িয়ে খায় ।

সূর্য ডুবলে অন্যজগৎ থেকে আসে কিন্নর কিন্নরী ও গন্ধর্ব -রা । তাদের সাহায্য নিয়ে মেয়ে হিলিং দেয় । অনেক পশুপাখী রোগমুক্ত হয় । বনজ নানান মানুষও আসে ওদের গৃহকোণে ।গাছবাড়িতে থাকে ওরা । বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে । বাড়িটি শান্ত বনভূমে একটু ব্যাতিক্রম কারণ মানুষের কলকাকলিতে মুখরিত । বিজলীকে হিলিং দিতে হলে সশরীরে কোথাও যেতে হয়না । অনেক দূরের কোনো চেতনাকেও সে হিলিং দিতে পারে । বিজলী অনেক কিছু জানে শরীর সম্পর্কে ।

খুঁটিনাটি । সে জ্ঞানের ভান্ডার । তাকে প্রশ্ন করলেই উত্তর মেলে । বলে আকাশের নক্ষত্রে আছেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় । স্বর্গের চিকিৎসক । ওরা ফুলের মধু দিয়ে রোগ সারায় । তবে পুষ্পকানন এখানে নয় , মেঘের ওপাড়ে ।

---বিজলী ও বিজলী , মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যায়না । দেখ তো কত হরিণ এসেছে ওষুধ নিতে ।

একপাল হরিণ এসেছে , কেউ অসুস্থ কেউবা আগে থেকেই শরীরের ব্যাপারে তৎপর ।

বিজলী গাছবাড়ি থেকে তরতর করে নেমে ওদের কোলে নিলো । গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো । সরল চোখের প্রাণীগুলি করুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে । অনেক শিকারী মজা দেখার জন্যে এদের ইচ্ছে করে মেরে ফেলে । তারপর চামড়া খুলে চলে নরউল্লাস । মৃগনয়নী যত কষ্ট পায় তত মানুষের আনন্দ বাড়ে ।

-এবার দেখ তোর সুন্দর চোখজোড়া খুঁচিয়ে কেমন অন্ধ করে দিই- হা হা হা করে গগনভেদী শব্দে হেসে ওঠে সভ্য মানুষ ; অসভ্য হরিণের ব্যাথা দেখে ।

বুনো বিজলী একা একা হেসে আবার ওপরে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে ।

--কেশরী কেন হঠাৎ এই বনে এলো জনপদ ছেড়ে ?

গল্পের মাঝে প্রশ্ন করে মন্থরা ---

জানা যায় যেই রঙ্গলি গ্রামে তারা মা ও মেয়েতে বাস করতো সেই গ্রামে মেয়ে হয়ে জন্মালে খুব ছোটবেলায় তাকে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটানো হত । যদি পা না পোড়ে তাহলে সে সচ্চরিত্রা , নাহলে পরে কলঙ্কিনী হতে পারে । আগুনের ওপরে হাঁটলে কার না পা পোড়ে ? কাজেই পরের পদক্ষেপ হল মেয়ের চরিত্রশুদ্ধির জন্য তার মাথায় শক্ত নারকেল মেরে ভাঙা ।

মাথা ফেটে যেতো । তাতেই নাকি অশুভ শক্তি মুক্তি পেয়ে ঐ মেয়েকে ছেড়ে দিতো ।

কেশরী একে কুসংস্কার বলতে নারাজ । ওর মতে এটা ঐ গ্রামের নিয়ম । বংশ পরম্পরায় মানুষ মেনে চলেছে । কেউ প্রতিবাদ করেনা । কেশরীর ভালো লাগেনি । নিজে কৈশোরে কিছু করতে পারেনি । কিন্তু মেয়েকে বাঁচিয়ে এনেছে ।

তবে ওর মরোদ সুবল সিং মারা যাওয়াতে সুবিধে হয়েছে । সে জীবিত থাকলে মেয়েকে নিয়ে গ্রামছাড়া পথে চলতে সক্ষম হত কিনা ভাববার বিষয় ।

রঙ্গলি গ্রামে আরো অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে । এখানে মানুষ জন্মদিন পালন করেনা । মহা সমারোহে পালিত হয়ে মৃত্যুদিন । ওদের লজিক হল : জন্ম কারো হাতে নয় । আত্মীয় বাছা যায়না । তবুও জীবনের প্রতিক্ষণে প্রায় সবাইকেই অনেক সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় । অথচ খুব কম মানুষই শান্তির সন্ধান পান ।

তাই মৃত্যু মানে সমস্ত কষ্টের শেষ । পাড়ি দেবে সবাই এক অচিন দেশে । যেখানে চিরশান্তিতে অবগাহন করা যাবে । তাই ওরা

মৃতদেহকে ঘিরে অনুষ্ঠান করে । গান বাজনা করে । পুষ্পবৃষ্টি করে ।

এক মেয়ে , নাম তার ডঃ পারুল সাহা, অরণ্যের মেয়ে -বিজলীর কাছে হিলিং নিতে মাঝেমাঝে শহর থেকে আসে। সে এক রেডিও ফিজিসিস্ট । প্রচুর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করে । শরীরে বিষ জমেছে । তাই রাতের অন্ধকারে এখানে আসে সুস্থ হতে , দেহকে বিষমুক্ত করতে ।

গন্ধর্বের দেওয়া চাঁদনী রাতের আলো ঔষধিতে দেহ বিষমুক্ত হয় । শীতল এক আবেশে প্রতিটি কোষ শুদ্ধ , স্নিগ্ধ হয় ।

পারুলের বাবা মারা যান ও যখন স্কুলে পড়ে তখন । বড় চাকরি করতেন, সরকারি চাকরি । আমলা ছিলেন । মা ছিলেন চিরদিনের গৃহবধূ । তবে গৃহবধূদের মধ্যে অনেকেই সংসারটি শক্ত হাতে ধরে থাকেন , পুত্রকন্যাদের সুশিক্ষা দেন, স্নেহ ভালোবাসায় ঘিরে রাখেন । পারুলের মনে হয় এ বড় কঠিন কাজ । কোনো ছুটি নেই । আর মাইনেও নেই ।

কিন্তু ওর মা বিভা অন্যজাতের মহিলা । লোকের নিন্দা করা , ক্ষতি করা এই ছিলো তার কাজ । ওর বাবা বলতো : ছুটির দিনেও অফিসে চলে যাই কাজ আছে বলে , বাড়িতে থেকে কী করবো ? বিভা খালি কার ফ্ল্যাটে কী হল , কার পর্দা কতটা উঁচু ও বেমানান এবং কার গাড়ি কত দামি তাই নিয়ে আলোচনা করে । আমার ওসব ভালোলাগেনা । তাই অফিসে এসে নিরিবিলিতে সময় কাটাই ।

ওর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রিয়মণি কাকু বলতেন : বিভা খুব তরল । জীবনে দুটি সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোনো সিরিয়াস কাজ কী করেছে কখনো ?

আসলে বাবা ছেলেবেলা থেকে মা কে চেনে । পাশের বাড়ির মেয়ে । নেকিয়ে নেকিয়ে কথা বলতো । কমবয়সে বাবার মনে ধরে যায় । পরে বিয়ে । ভারতীয় সমাজে ডাইভোর্স তো অত চলেনা , চট করে কাউকে কেউ ছাড়েনা তাও আগের জেনেরেশানে , মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে , তাই বাবা এই স্ত্রীকে নিয়েই চলেছেন ।

বাবার মৃত্যুর সময় পারুল ভাবছিলো : এবার কী হবে ?

সবাই যখন শোকে কাহিল তখন পারুল কেবল ভাবছিলো : বাবা এই ছিলো, এই নেই । কী নেই ? চেতনা । একটি চেতনা নেই বলে ওদের সবার জীবন আজ বদলে যাবে । ওর দাদা ভাষাবিদ্ । আমেরিকায় একটি নামজাদা কলেজে পড়তে গেছে ।গবেষণা করে অ্যাফ্রিকান জুলু ভাষা নিয়ে । একটি নাইজেরিয়ান বান্ধবী আছে । কুচকুচে কালো মেয়ে কোকোম্মা । খুব হাসিখুশি । সুন্দর ইংরেজি বলে । আগে ইংল্যান্ডে ডাক্তারি পড়তো । পরে আমেরিকায় গেছে । ও এখন আর ডাক্তারি করেনা । একটি কোম্পানিতে কাজ করে । সেখানে মেডিক্যালের বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি হয় । তাতে ওরা কজন ডাক্তার সাহায্য করে ।

পারুলের দাদা পদ্মনাভ ওর বয়ফ্রেন্ড । একসাথে থাকে ওরা । বাবার মৃত্যুর সময় পদ্মনাভ আসেনি । কাজ ছিলো । শ্রাদ্ধের সময় এসেছিলো । সাথে কোকোম্মা ।

শর্টে কোকো । কোকো খুব ভালো মেয়ে । দারুণ ভালো । কালো হাসি সাদা মন । ।ওর মনে নিজের প্রতিফলন দেখা যায় ।

বাবা মারা যাবার পরে মা চাকরি পায় কেরানী হিসেবে মণিপুর হাউজে। সরকারি কাজ । জীবনের চাকা ঘুরে যায় মায়ের । পরে দাদার বিয়ে দেয় । তবে কোকোর সাথে নয় । ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো । দাদা বিয়ে করে এক অন্য মেয়েকে খবরের কাগজ দেখে । প্রবাসী বাঙালী । মেয়েটির বাবার এলাকায় খুব নাম । কৃপণ বলে ।

পিঁপড়ে মেরে চিনি বার করে । খুব ধুরন্ধর । সেই মানুষকে ম্যানেজ করা দাদার বিয়ের পরে -মায়ের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তার তরল মা বিভা, ঘর ও বার দুই-ই তখন দক্ষ হাতে সামলেছে । যারা আগে বলতো মা কোনোদিন সিরিয়াস কিছু করতে পারবে না তারা নিশ্চুপ এখন । এইভাবেই বুঝি সব বদলায় । বদলে যায় সৈকত , নদীর চরা ও গাঢ় নীল মেঘে ঢাকা আকাশ ।

মা বাড়ির বাইরেও যেতো না তেমন । অনেক নিন্দুক যারা মায়েরও ওপরে তারা বলতো : ওর মা হল মর্ডান ঝি । ন্যাকা ঝি । বা হেড ঝি । অন্য ঝিদের পরিচালনা করে ।

ওর নাম মাঈঝি দিয়েছিলো অনেকে । পারুল শুনেছে ।

মার মত নিয়েই সে ফিজিক্স পড়ে । বাবা চেয়েছিলেন সে ইঞ্জিনীয়ার হোক । কিন্তু ওর ফিজিক্স ভালো লাগতো । পড়াশোনাতে তুখোড় ছিলো । সবথেকে ভালো লাগতো রেডিয়েশান নিয়ে কাজ । এখন অনেক বছর হল কাজ করছে । বিকিরণে দেহ ক্লান্ত । সব টক্সিন ধুয়ে ফেলতে চায় তাই আসা এই বনবালার কাছে । ওর কাছে কিন্নর কিন্নরী অথবা গন্ধর্ব কোনো মিথ নয় । ওরা অন্যগ্রহের প্রাণী যাদের কাছে অনেক হাই-এন্ড চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে । ও এইভাবেই ভাবে । ও মুক্তমনা । ওপেন মাইন্ডেড । অতএব ।

মায়ের মেটামর্ফসিস্ শিক্ষণীয় । এখন মা অনেক গম্ভীর । জীবন পথে হেঁটে দেখেছেন কত কঠিন ! বাড়ি বসে বসে লোকের সমালোচনা করা কত সহজ । তবে মা শিখে নিয়েছে এটাই ওঁর কৃতিত্ব । মায়ের গুণ ছিলো । খুব ভালো ছবি আঁকতো । মধুবনী পেন্টিং শিখেছিলো । ফাইন আর্টের হাত খুব ভালো ছিলো । দিদার ইচ্ছে ছিলো মা শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়ে অঙ্কনে পটিয়সী হোক্ । কিন্তু দাদু বিয়ে দিয়ে দেন । হয়ত কিছুটা ফ্রাস্টেশানেই মা নিন্দে মন্দের পথ বেছে নেয় । কে জানে ! অন্যকে টেনে নিচে নামিয়ে নিজে ওপরে ওঠা ।

এখন মা শনি রবিবার বাড়িতে আঁকা শেখায় । কিছু ছাত্র আসে । যদিও মায়ের প্রথাগত শিক্ষা নেই তবুও যারা আসে তারা আরো লোককে নিয়ে আসে । এমনই মায়ের ছবি আঁকায় পারদর্শিতা । ওয়ার্ড অফ মাউথ থেকেই ছাত্রছাত্রী বাড়ে ।

মা ভালো আছে, বেশ ভালো আছে । শুধু কোকোর কথা মাঝে মাঝে বলে । আর পারুলের বিয়ের কথা ।পারুল বিয়ে করবে না ।কারণ বিয়ে হলেই ক্যারিয়ার খতম বলে ওর মনে হয় ।

আর ওর দেহে এত রেডিয়েশান জমা হয়েছে যে কাউকে বিয়ে করা মানে একভাবে তাকে ঠকানো । তার শরীরটিও যাবে ! নয় কি ?

নাচ গাছ

একটি কাঠের তৈরি ছোট গাছ । সেই গাছটি নাচে । বহু শতাব্দী পূর্বে কোনো মহারাজা তার কারিগরকে দিয়ে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি তৈরি করান । রাজার দু:খ হলে উনি গাছটিকে নাচাতেন । মন ভালো হয়ে যেতো । বহুবার শুনেছে পপি ওর বাবার কাছে ।

বাবা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক । ছোট শহর আকবরপুরে একটি কলেজে ইতিহাস পড়াতেন । পড়াতেন মানে এতই পড়ানোতে জড়িয়ে পড়েন যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানান ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরে বিষয় বুঝিয়ে দিতেন । রাণাপ্রতাপের কেল্লা , ফতেপুর সিক্রি , হাজার দুয়ারি , পল্লব ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের চারণভূমি- ইত্যাদিতে গিয়ে গিয়ে ছাত্রদের কাছে ইতিহাসকে করে তুলতেন বর্তমান !

--ঐ শুনতে পাচ্ছো ঘসেটি বেগমের হাসি, চাপাস্বর ? --ঐদিকে দেখো মহারাণী পদ্মিনী আসছেন ধীর পায়ে !

এইভাবেই বাবা ছাত্রদের প্রিয় টিচার হয়ে ওঠেন । নিজের খরচে নানা ঐতিহাসিক জায়গায় নিয়ে যেতেন । পকেটে টান পড়ে । শেষে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন । বলেন : ব্যবসা না করলে টাকা হয়না । মাস্টারদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় ।

কলেজ ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন । অ্যান্টিকের ব্যবসা । নানান ইতিহাস জড়ানো বস্তু নিয়ে কেনাবেচা করা । মোটামুটি ভালই আমদানি হত । মুস্কিল হল নাচগাছ আসার পরে । বাবা কোনো খরিদ্দারকে নাচগাছের ইতিহাস বলতে গিয়েই ভাবুক হয়ে যেতেন

। খরিদ্দার নয় যেন ছাত্র ! লেকচার দিতে শুরু করতেন , আবেগে ভরপুর হয়ে যেতেন ।

ব্যবসা লাটে উঠলো । বাবা একটি দূর্ঘটনায় মারা গেলেন । নিজেকে ফেলিওর ভাবতেন । অধ্যাপনা হলনা , ব্যবসাও হলনা । ছোট শহরে এমনিতেই অ্যান্টিক কেনার লোক কম । খুব ধনী কিছু মানুষ আসতেন । তারপর ওঁর ভাব ও আবেগ দেখে অনেকেই আর এদিকে পা বাড়াতেন না ।

মৃত্যুর পর পপির ওপরে সব দায়িত্ব আসে । ছোট ছোট ভাইবোন ও মা । তাদের ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব । ওরা যেখানে থাকতো সেই আকবরপুরে অনেক প্রাচীন কেল্লা ও রাজদরবার ছিলো । সেখানে বহুমূল্য সব বস্তু ছিলো । পপির অনেক বন্ধু ঐসব জিনিস নিয়ে অন্যদেশে চালান দিতো, চরা দামে । কমবয়সী ছেলেমেয়ে সব । একটি দল ছিলো । পপি নিজের দুরাবস্থা ফেরানোর জন্যে ঐ দলে সদস্য হিসেবে যোগ দেয় । বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দামী জিনিস পাচার করে বেশ অবস্থা ফিরে যায় ।

ওর মা জীবনের ওঠাপড়া দেখেছেন , কাজেই সব হিসেব করে করতেন । কাউকে নেমন্তন্ন করলে বিয়ে অথবা জন্মদিনে , কত টাকার উপহার দিয়েছে তারা তা লিখে রাখতেন ওর মা ।

ওদের বাড়ির অনুষ্ঠানে একই দামের জিনিস যেতো ।

পপির হাসি পেতো কিন্তু কিছু বলতো না । মেয়ে চোরাচালানকারীর মা একটু অদ্ভুত হবে এ আর এমন কি ! মা বলতেন : কাউকে কাঠি গলাতে দেবো না । জীবন একটি

হিসেবের খাতা । যত দেবে তত পাবে । পপির মনে হত বিখ্যাত উক্তি: '*there's no such thing as a free lunch*' --- কিন্তু মা জানলো কি করে এই অর্থনৈতিক ফান্ডা ?

পরে আকবরপুরে সরকারের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক স্থানগুলি সিল করে দেওয়া হয় , অযত্নে এতদিন ঐসব মূল্যবান দ্রব্য পড়ে ছিলো । খবর ছড়িয়ে পড়তেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় । এখন কেউ ওদিকে যায়না । কিন্তু আগেই পপি ও তার বন্ধুর দল বহু জিনিস পাচার করে দিয়েছে । আসলে ওর এক বন্ধু একবার একটি পেতলের মূর্তি ওর বাবাকে দেখাতে আনে । একটি কেল্লার কাছে পায় । বাবা বলেন ওর দাম কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে । কোনো রাজঘরাণার মূর্তি ওটা । সেই শুরু । চোরাকারবারের । এমন যুগ পড়েছে যে অর্থের জন্যে মানুষ যেকোনো কাজ করতে সক্ষম ।

পপির অনুশোচনা হয় । কিন্তু কী করবে ? বাবা মারা যেতে সবার দায়িত্ব পড়লো ওর ওপরে । এখন ও বেশ মোটা টাকা করে ফেলেছে । লোকে জানে ও শেয়ারবাজারে কাজ করতো । বাবার অ্যান্টিকের ব্যবসাটিও জুড়েতেড়ে চালাতো । কাজেই কেউ কিছু সন্দেহ করেনা ।

আর এখন ও গাড়ির ড্রাইভারি করে আর ভিডিও ফিল্ম বানায় । বিয়ে কিংবা জন্মদিনে লোকের বাড়ি গিয়ে ভিডিও তুলে আনে । অ্যান্টিকের দোকানটি এক রাজস্থানীকে বিক্রি করে দিয়েছে । সরকারি নজর এই এলাকাতে পড়ায় এই ছোট্টশহর এখন রাতারাতি বিখ্যাত । এখানে আবার একটি প্রাকৃতিক জলাশয় আছে শঙ্খের আকারে । তার জল নীল , বেগুনি ও লাল । আলাদা আলাদা তিনটি রং দেখা যায় । জল কখনও শুকায় না । কোথার থেকে জল আসে কেউ জানেনা । কোনো ঝর্ণা বা নদীর সাথে যুক্ত নয় ।

একসময় এখানে ঘোড়ার আস্তাবল ছিলো । পরে লেকের সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত রঙ এর । এই লেকে বিচিত্র প্রাণী ও মৎস্যের দেখা মেলে । একটি দর্শনীয় স্থান ।

কাজেই দোকান বেচতে অসুবিধে হয়নি । এখন অনেক মানুষই এখানে হানা দেয় টুর্যিস্ট হিসেবে ।

পপির আত্মগ্লানি হয় কি ?

নাহলে ও গাড়ি চালিয়ে দিন কাটায় কেন ? ওর তো অর্থের অসুবিধে নেই । ভাইবোনগুলিও নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে ! মা ভালো আছেন ।

আসলে ও বলে : অভাবে পড়ে নিচে নেমেছিলাম । এখন অভাব নেই তাই কষ্ট করে নিজের পাপের বোঝা কমাতে চাই । গাড়ি চালাই কিন্তু ভাড়া নিই খুব কম । বিশেষ করে গরীব মানুষদের ফ্রিতে তরী পাড় করাই । ভিডিও করি পয়সার চেয়েও মনের তাগিদে । আমার ভালোলাগে । নিজেই নিজের আত্মশুদ্ধির রাস্তা খুঁজে নিয়েছি । বিয়েও করিনি । আমার পাপের চিহ্ন আমার সাথেই শেষ হয়ে যাক । অন্য কোনো সত্ত্বাকে এর মধ্যে জড়াতে চাইনা ।

মাঝে মাঝে পপি রাস্তায় সবার সামনে হামা দিয়ে হাঁটে । হামা দিতে দিতে মাইল খানেক চলে যায় । লোকে জিজ্ঞেস করলে বলে : আমার মেরুদন্ডটা বেঁকে গেছে । দুনম্বরী করে করে ।

সহজ স্বীকারোক্তি । কিন্তু সরল সোজা কথা মানুষ আর ধরেনা । সব কিছুকে বেঁকিয়ে ধরাই মর্ডান মানুষের স্বভাব । মানুষ হেসে ওঠে !

--দুনম্বরী ? আর আপনি ? আপনার মতন ভালোমানুষ , বাবা মারা যাবার পরে পুরো পরিবারের বোঝা টানা আজকালকার কোনো মেয়ে করবে না ! নিজের তো ঘর হলনা । অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর ! আসলে আপনি মনে হয় পুরো সমাজের বোঝা বইতে চান!

তা হ্যাঁ , আজকাল যা অবস্থা ! দুনম্বরী আর ব্যাক স্ট্যাবিং খুব কমন । নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে লজ্জা করে । তবে এখন মানুষ মহাকাশচারী ,কাজেই প্লুটো বা জুপিটার থেকে হয়ত আসবে কিছু ফ্যান্টাসি মানুষ অর্থাৎ ফানুস আর আমাদের অমৃতের পথ দেখাবে । এই যা ভরসা । তা আপনাদের বাড়ির ঐ নাচ গাছটা কেমন আছে ? ওর নাচ দেখলে যাই বলুন মন একেবারে ভালো হয়ে যায় । সেইযুগে এরকম যন্ত্র তৈরি !

আপনার বাবার মতন পন্ডিতমানুষের সংস্পর্শে না এলে এগুলি অজানাই থেকে যেতো, তাইনা ? আপনি আপনার পন্ডিত পিতার সুকন্যা । স্বভাবে , দায়িত্বে , বিচারে ।

ফিরোজা আকাশ

এই গল্পটি মনু ও গোমতীর । মনু এখন বিদেশে থাকে । কৈশোরে সে এক সাহেবের সাথে বিদেশে আসে , ত্রিপুরা থেকে । মনু দেববর্মণ । ত্রিপুরার মোহরছড়া গ্রামের ছেলে ।

স্কুলে পড়তো গোমতী । গোমতী কর্মকার । বাঙালী মেয়ে । দুজনে একসাথে পড়তে পড়তে ভাব ভালোবাসা হয় । স্কুল ফাইনাল পাশ করার পরেই রূপসী গোমতীর বাবা ওর বিয়ে দিয়ে দেন ওদেরই স্কুলের পিটি টিচারের সাথে । সেও বাঙালী ।

বেচারা মনু ! মনে ও বুকে পাথর বেঁধে চলে জীবনযাত্রা । রাতে ওদের পিটি টিচারের মুখটা মনে পড়তো । গোমতীকে চেটেপুটে খাচ্ছে । কপালের দুদিকে শিরাগুলি দপদপ করতো । অসহ্য যন্ত্রণা সারা গায়ে । ঘুম হতনা । বাইরে বেরিয়ে কুমার শানুর গান গাইতো--ঘুমাও, ও চাঁদ ঘুমাও , ঘুমাও ও ফুল ঘুমাও -আমরা দুজন আজকে রাতে থাকবো শুধু জেগে !

দূর্বিষহ জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পেতে কিছুদিন পরেই ও এক পরিব্রাজক সাহেব এর সাথে বন্ধুত্ব করে বিদেশে পাড়ি দেয় । হয়ত স্থান পরিবর্তন করলে মনেও আসবে পরিবর্তন এই মনে করে । বিদেশে গিয়ে ওকে নানান কাজ করতে হয় । সাহেব ওকে টিকিট কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের সুবিশাল ফার্মে জীবন্ত কাকতাড়ুয়ার কাজে নিয়োজিত করেন । কাকতাড়ুয়া সেজে ওকে দিনের পর দিন রোদে ঝড়ে জলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত ক্ষেতে । পয়সা পেতো সামান্য তবে সাহেবের ফার্মে থাকা ও খাওয়া ফ্রি । যদিও

ঐ খাদ্য ওর অখাদ্য লাগতো । পাউরুটি , স্যুপ , ফলমূল ও মাংসের থকথকে ঝোল । গরু , ভেড়া , হাঁস, মূর্গী , পায়রা , টার্কি , হরিণ ইত্যাদি । হরিণ আবার শিকার করে নিয়ে এসে রান্না করে খাওয়া হত ।

বেশ কিছুদিন ওখানে ছিলো । দেশটাকে বেশ বুঝে নিয়ে একদিন বিদায় নেয় সাহেবের কাছ থেকে ।

ছোট খাটো কাজ করতে করতে যোগ দেয় হেলথ্ কেয়ারে । ও রক্ত সংগ্রহ করতো ব্লাড ব্যাংকের জন্য ।ওদের বলা হয় ভ্যাম্পায়ার।পুঁথির ভাষায় হয়ত বলা চলে অনেকটা আমাদের Phlebotomist---!
মোটামুটি মন্দ কামাতো না । বিভিন্ন মানুষের সাথে তো পথঘাটে দেখা হয়ই । তাদেরই মগজ ধোলাই করে যদি কিছু রক্ত সংগ্রহ করতে পারে তাহলে বোনাস মাইনে পেতো । প্রতি মানুষের জন্য নির্ধারিত টাকা পেতো । নানান ইমোশন্যাল ও সেন্টিমেন্টাল তথ্য শুনিয়ে , মানবতার বুলি কপচিয়ে একস্ট্রা কামানো আর কি ! ধীরে ধীরে মনুর ভ্যাম্পায়ার হিসেবে নাম হয় । এখন আর ও স্যুপ খায়না । নিজের হাতে রান্না করে খায় প্রিয় সমস্ত খাবার । শবনম কারি অথবা শুক্তো।

তা খাবার খেতে জানে বটে এরা । মাংসের যে কতরকমের আইটেম হয় বিদেশে না এলে ও জানতে পারতো না । আর কতরকমের মানুষ দেখতে পেলো এখানে এসে । খুব ভালোলাগে ওর । সবাই মানুষ । একই তো হৃদয় -একই সুর , ছন্দ ,লয় । যারা জাতপাত , উঁচুনিচু , অভিজাত হতশ্রী নিয়ে খুব মাথা ঘামায়

তারা কি কখনো ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নেয়নি ? সেই রক্ত কার , কোথার থেকে এলো কেউ কি হিসেব করে ? পেট ও প্রাণের দায়ে নত হয় অনেক পাহাড় ।

সমস্ত উঁচু নিচু ভেঙে সমান হয়ে যায় তবুও যতক্ষণ থাকে রক্তগরম ততক্ষণ আবার জাতপাত , সিঁড়ি আর সিঁড়ি । কেউ ওপরে বসে কেউ নিচের ধাপে । যেন মাঝখানে চলেছে সার্কাস শো । চারপাশে অজস্র গ্যালারি । কোনোটা জাতপাত, কোনোটা শ্রেণী, কোথাও বা রং-রূপ আবার কোনোটা শিক্ষা অশিক্ষার জন্য নির্মিত । এই দুনিয়ার দস্তুর ।

মেনে নেওয়া ব্যাতীত উপায় নেই । সমাজ সংস্কারকগণ আসেন , যুগে যুগে । কিছুদিন শান্তি ।

আবার নতুন উৎপাত পিছুধাওয়া করে মানব জাতির !

ওদের ত্রিপুরার ছোট্ট গ্রামটি সুন্দর । সুললিত । কৈশোরের কত স্মৃতি জড়ানো পথঘাটে । সরল মানুষগুলি । কচি কাঁচাগুলি । আর এখানে মানে পরবাসে এক অন্যস্বাদ । দুটে খুব ভালো ।

এইভাবেই অনেক বছর কেটে যায় । নানান মেয়েরা দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেয় ।

বিদেশে এসব কমন । কেউ শারীরিক সম্পর্ক করলে এক সপ্তাহের খাবারের বিল দিয়ে দিতো । কেউ কোনো বড় শহরে ঘুরিয়ে আনতো । তবে ও বেশি ওদিকে যায়নি ।

কমবয়সী যুবক হিসেবে দু তিনখানা সম্পর্ক হয়েছে । গভীর কিছু নয় । তবে এক বান্ধবীর যমজ বাচ্চা ছিলো দুটো । দুটে ফুটফুটে দুই ছেলে । একদম একরকম দেখতে ।

ভারি মিষ্টি । সেই বাচ্চাদুটির বাবা মারা গিয়েছিলো । থাইমাস গ্ল্যান্ডের ক্যান্সারে । এই ক্যান্সার এতই কম হয় যে খুব কম চিকিৎসক এর চিকিৎসা বিধি জানেন ।

ভদ্রলোকের প্রথমে লাং ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় । পরে এক সার্জেন বলেন যে লাং-এ ক্যান্সার নেই আছে হার্টের কাছে থাইমাস গ্ল্যান্ডে । ভুল চিকিৎসায় অনেকটা সময় নষ্ট হয় তাতে ক্যান্সার হার্টের দিকে ও অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে যায় । ঐ দুই ফুলের মতন শিশুর বাবা ডাইলান মারা যায় । ওদের মায়ের সাথে বেশ কিছুদিন বন্ধুত্ব ছিলো । পরে মেয়েটি আমেরিকা পাড়ি দেয় ওর কাজের কারণে । সে এক নার্স ছিলো কিন্তু নার্সিং ছেড়ে একটি ব্যবসা শুরু করে , খুব অদ্ভুত ব্যবসা । মৃতমানুষের গায়ের ধূলো নিয়ে লকেট বানিয়ে দেওয়া । আসলে নার্স হিসেবে কাজ করতে গিয়ে অনেক মৃত্যু দেখেছিলো ।

প্রিয়জনের চলে যাওয়ার পর অন্যদের কষ্ট দেখে দেখে এই আইডিয়া আসে মাথায় । যে চলে যায় সে তো যায়ই । যারা রয়ে যায় তাদেরই বেদনা । সেই ব্যবসার কারণে অন্যদেশে গমন। সেইসময় মনু বলেছিলো যে --তুমি চলে যাও, বাচ্চাদুটিকে আমায় দিয়ে যাও । ওরা এত মিষ্টি আমি ওদের ছেড়ে থাকতে পারবো না ।

হেসে ওঠে গালে টোলে ফেলে মইরা । স্বর্ণকেশী , পকক্ বিম্বোষ্ঠী ।

--পারবে রাতের ঝামেলা সামলাতে , অসুস্থ হলে রাত জেগে কাটাতে ? রোজ স্কুলে দেওয়া ও পড়া করাতে ?

মনু কথা বাড়ায়নি । লং ডিস্ট্যান্স সম্পর্ক রাখা মুস্কিল । তাই দুজনের সম্মতিতেই ওরা আলাদা হয় । মইরা আবার বিয়ে করেছে । চিঠি চালাচালি ও ফোন হয় ।

মুঠোফোনের রিং রাঙিয়ে দেয় মইরা ।

মৃতমানুষের গায়ের ধূলো সংগ্রহ করার জন্যে একটি যন্ত্র ছিলো । সেই যন্ত্র খুব সুক্ষ্ম কণা তুলে নিতে সক্ষম । বিদেশের এই এক মজা । টেকনোলজি যে কোথায় যেতে পারে তার চূড়ান্ত নমুনা ।

বেশ কিছুকাল পরে ও ভারতে যায় । বেশ অনেক বছর পরে । সময়টা বসন্তকাল । নিজের গ্রামের পথে হেঁটে বেড়ায় । পুরনো চেনা লোকেদের সাথে গল্পকথা -- বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় এতদিন ? প্যান্ট শার্ট তো সাহেবদের মতন । মুখে ইংরেজি বুলি , ফটফট । সবাই ওকে দেখতে চায় । বাবা আর নেই । মা খুব খুশি । খুশি দাদারা দিদিরা বৌদি জামাইদাদারা । আর যার জন্যে গ্রাম ছাড়া ? সেই গোমতী বিধবা হয়ে দিন কাটাচ্ছে । পিটি টিচারের মৃত্যু হয়েছে অকালে । ছিনতাইকারীর ছোরার আঘাতে । তারপর থেকে বেচারি গোমতী দুটি যমজ সন্তানকে নিয়ে বাবার কাছে থাকে ।

এক চাঁদনীরাতে দেখা হয় পথে। কিছু কথা হয় । বেশির ভাগটাই মৌনতা । মৌনমুখর । ঊর্মিমুখর , নির্ঝরের স্বপ্ন হল সত্যি !

বাড়ির লোকই প্রথম প্রস্তাবটি তোলে । তারপর গোমতীকে জানানো হয় । গ্রাম হলেও কেউ আপত্তি করেনি বাঙালী বিধবার পূনর্বিবাহে । গোমতীর বাড়ির লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে । মেয়েটার জন্য সবার খুব চিন্তা হত । বাবা মা তো চিরকাল থাকেন না !

মনুর মা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে , কোমড়ে হাত রেখে সব তদারকি করছিলেন ।

ওদের বিয়ে হয়ে গেলো । তারপর চারজন মিলে বিদেশে পাড়ি ।

যেই দুই যমজ শিশুকে হারিয়ে খুব দু:খ পেয়েছিলো তা পূরণ হয়ে গেলো ভাগ্যচক্রের জন্য ।

গোমতীর দুই সন্তানকে দত্তক নিয়েছে মনু ।

ওরা ভারি মিষ্টি ও দুষ্টু । নাম জয় ও বিজয় ।

দুজনকেই গোমতীর মতন দেখতে । ভাগ্যিস্ ! পিটি টিচারের মতন হলে মনুর হয়ত তত ভালোলাগতো না ।

ওরা এখন একটি বনচরদের গ্রামে আছে । বেড়াতে এসেছে । এখানে মেয়েরা বুকে কোনো কাপড় রাখেনা । নিচে কাপড়ের ফালি থাকে । বুকে পুরুষেরা কিছু ঢাকা দেয় না । মেয়েরা মোটা মোটা পুঁথির অজস্র মালা পরে লজ্জা নিবারণ করে । কেউ বেশি কথা বলেনা । পায়ে পরে থাকে অদ্ভুত ঘুঙুর । সেই ঘুঙুরের

আওয়াজে হেরফের ঘটিয়ে নানান সংকেত পাঠায় । সেগুলিই এক একটি কথা । আর ছবি এঁকে এঁকে অনেক কিছু বলে ।

নীরবতায় অবগাহন করা । এই বনের ধারে সাদা সাদা বালির চর । রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করে । রূপার খনি মনে হতে পারে । এই বালিয়াড়ির এক রহস্য আছে । এটা আসলে একটি হ্রদ । নাম পুষ্পকমল । হ্রদটি হঠাৎ হঠাৎ শুকিয়ে বালির চর হয়ে যায় । রাতারাতি শুকিয়ে যায় । ভাবুকেরা বলেন : পাতাল থেকে কোথাও সমুদ্রের সাথে যোগ আছে ।

বনচরেরা একে রহস্যঘেরা সরোবর বলেই মনে করে । হ্রদ শুকিয়ে গেলে বসে উৎসব । নাচ গান বাজনা । আবার জল এসে প্লাবিত হয় বালুচর । হঠাৎ । তখন অন্য ধরণের জীবনের স্পর্শ । রং বেরং এর মাছ কোথা থেকে এসে হাজির হয় । জল চলে গেলে মরা মাছের সারি দেখা যায় । সেই মাছ চরায় শুকিয়ে বনের মানুষ ভক্ষণ করে । এই অপরূপ জায়গাটির নাম ওড়নিয়া । ওড়নিয়া গ্রামের ধারে যেই মানুষগুলি থাকে তারা বহু শতাব্দী ধরে একটি নিয়ম মানতো । ওদেরই অন্য গোষ্ঠীর সাথে বিকিকিনি সারতে এই পুষ্পকমল হ্রদের কাছে আসতো । নানান গোষ্ঠীর মানুষ নানান ধরণের জিনিস নিয়ে আসতো । কেউ মাংস , কেউ আনাজ কেউ বা বিভিন্ন পশুপাখির ডিম , কেউ কেউ পোকামাকড় আনতো । কেউ আনতো হাতে বোনা একফালি পরণের কাপড় যা দিয়ে নিম্নাংশের লজ্জা ঢাকে ওরা । এইভাবেই বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন চলতো । একবার ওরা এসে দেখে হ্রদ হঠাৎ বালুচরে পরিণত হয়েছে । তাতেই ওদের সমাজের মাথারা ভেবেছেন এ হয়ত কোনো দেবতার রোষের নমুনা । তাই রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করার জন্যে ব্যবসা বন্ধ

করে ওখানে নাচ গান বাজনা যজ্ঞ করা হয় । সেই প্রথাই আজ অবধি চলেছে ।

ওড়নিয়া গ্রামে মনু ও গোমতী দুজনে আসে । দুই ছেলে আসেনা । ওরা পড়াশোনা করে হোস্টেলে থেকে । সাবলম্বী হবে হোস্টেলে থাকলে ।

মনু ও গোমতীর নিজস্ব সময় এটা । যদিও বাস্তবের কঠিন আঁচড়ে জীবনের অনেকটাই দুজনে আলাদা কাটিয়েছে তবুও এই সময় ওরা একে অন্যদের সত্ত্বায় লীন হয়ে যায় ।

তবে কথা হয়না । কথা নেই আর । সব কথা শেষ হয়ে গেছে কেবল আনন্দ সাগরে ঢেউ গোনা বাকি ।

কিছু কিছু গল্প শুনে মন্থরা খুব রেগে যায় । সারা দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে ।

দুনিয়ায় অন্যায় বেড়েছে । রামরাজ্য নেই । বেশিরভাগ মানুষেরই পদস্খলন হয়েছে , হচ্ছে । চূড়ান্ত আশাবাদীরা তবুও সততার জন্যে লড়ে যাচ্ছেন , স্বচ্ছ সমাজের কল্পনা করে যাচ্ছেন আর নিরাশাবাদীদের এড়িয়ে চলার চেষ্টায় আছেন । আগে একজনই মন্থরা ছিলো এখন সবাই মন্থরা । কুব্জা খুশি না হয়ে রাগে কাঁপছে । সারা দেহ কাঁপতে কাঁপতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো । চারিদিকে এক আশ্চর্য থমথমে ভাব ও গাঢ় নীল আলো । কিছু সময় পরে আলো জমাট বেঁধে হয়ে গেলো ফিরোজা রঙের একটি অবয়ব । ফিরোজা আকাশ যেন ! ধীরে ধীরে ফিরোজা দেহ কুব্জ হল, হল মন্থর।

মন্থন করা হল আলোর ঢেউ থেকে অবিনশ্বর মন্থরাকে ।

পরের গল্প আবার শুরু হল । এবার ভিন্নস্বাদের এক অলীক কাহিনী ।

তুষারকণা

এই গল্পটা একটু জটিল । কলকাতায় থাকে সোমা ও তার বৃদ্ধা মা। দুই দাদার জন্মের অনেক পরে জন্মায় সোমা । তা প্রায় ১৮-২০ বছর পরে । দুই দাদার বয়সের মধ্যে মাত্র দুই বছরের ফারাক । ওরা বিবাহিত । বড়জন থাকে বিদেশে । পেশায় চিকিৎসক । সার্জেন ।

অন্যজন জীববিজ্ঞানী । বড়দাদা শিরিষ খুব বড়লোক । চিকিৎসা ব্যাতীত বৌয়ের নামে মদের চেন দোকান চালায় , ইলেকট্রিক মিস্ট নামে । প্রচুর পয়সা করেছে । বৌদি অপরূপা । মেদিনীপুরের মেয়ে । নাম দেবী । দেবী চিত্রকর । ওদের পূর্বপুরুষ পটশিল্পী অর্থাৎ পটুয়া ছিলো । পটচিত্র এঁকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান গেয়ে নানান পৌরাণিক কাহিনী শোনাতো । ঠাকুর্দা অবধি এই কাজ করেছে । বাবা মুদির দোকান চালাতো । বান্ধবীর সাথে পুজো দেখতে কলকাতায় যায় সেখানেই রূপসী দেবী, শিরিষের চোখ ও মন কাড়ে । বিয়ে হয়ে যায় ।

চৌকস মেয়ে । রূপ দেখে বিয়ে করে দাদা । আর কিছু দেখেনি । এখন চালাক চতুর বৌ মদের ব্যবসার দেখভাল করে । ওদের অনেক বাড়ি , বড় বড় শহরে । একটি বাড়ি এতই বড় যে সেখানে বারোটি স্নানঘর ।

- ওরা তো মাত্র তিনজন তাও ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়ে , এক ডজন বাথরুমে কে যায় ? হেসে বলেছিলো ছোড়দা, জীববিজ্ঞানী তমাল । তার কাছে টাকাপয়সা জীবন চালানোর একটি

ইন্সট্রুমেন্ট । এর চেয়ে বেশি টাকার দিকে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা হয় জানোয়ার হয়ে যায় অথবা মেশিন । তমালের জীবন দর্শন ।

- দাদাকে জিজ্ঞেস করিস্ , এবার কী হীরের কমোড ,সোনার বাথটব আর রূপোর সোফা বানাবে ? যত্তসব !

-বিলাসিতার বহর দেখে মরে যাই ! বলে ওঠে ছোটবৌদি বাণীবন্দনা ।

তমালের স্ত্রী বাণী, প্রজনন ক্ষমতার দোষে মৃতবৎসা ।

স্বামী বেশিরভাগ সময়ই থাকে বনজঙ্গলে । ওদের মা ওকে ডাকেন বনবাসী বলে ।

বড় ছেলে শিরিষ বলে : আমি মদের ব্যবসা করলে কি প্রচুর ডোনেট করি আর গরীব দু:খীদের বিলাই । আমাদের দেশে একটি জায়গা আছে যেখানে ভীনদেশী, পেরিনমার্কের মানুষ বসবাস করে । ওদের ঐ শহরে কোনো বিজলী বাতি নেই , পথঘাট কাঁচা । ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র নেই । ওরা সরকারকে ওখানে কাজ করতে দেয়না । বিভিন্ন সেন্টিমেন্টাল ইস্যুর জন্যে । আমি সেখানে গিয়ে ওদের ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুল করে দিয়েছি । বড় হাসপাতাল করে দিয়েছি আমার সেবা সংস্থার মাধ্যমে । ওরা খুব খুশি । ওদের কমিউনিটির জন্যে সরকার যা করতে পারেনি আমি করে দিয়েছি । এরপরে আমি যদি মদের ব্যবসা করি ক্ষতি কি ? টাকা কোথার থেকে আসছে সেটা না দেখে প্রয়োজনে টাকা পাচ্ছো সেটা মনে রাখো ।

বড়দার জীবনদর্শন এরকম । ওরা দেশে খুব একটা আসেনা । পুজোতে কিংবা পয়লা বৈশাখে কথা হয় ফোনে । মায়ের তো অনেক বয়স । শয্যাশায়ী । দেখভাল করে সোমা । সেই কারণে বিয়ে করেনি । করার সেরকম ইচ্ছেও নেই । মা বহুবার বলেছেন : ওরে পাগলি আমি মরে গেলে কি হবে ? আজ নয় কাল চলে যাবো । তুই তখন একা একা কী করবি ? আমার জন্যে বিয়েও করলি না !

সোমার বন্ধু ওর ছোটবৌদি । দুজনে অবসরে শপিং করতে যায় । নাটক দেখে , সিনেমা দেখে । এগরোল , বিরিয়ানি কিনে খায় । ছোড়দা তো বনেবাদারে ঘুরে বেড়ায় । ভাগ্যিস একটা সন্তান নেই ! নাহলে বেচারা বাবাকে কোনোদিন পেতোনা , বড় হবার সময় ।

সোমা, শিরিষ ও তমালের মা নলিনী দেবী সবসময় বলেন : আমার তোর জন্যে খুব চিন্তা হয় । দুই দাদার নিজ নিজ সংসার । তুই একা একা কী করবি ? চাকরিও তো করিস্ না !
-সে দেখা যাবেখন !ছোড়দা তো আমাকে তাড়িয়ে দেবেনা কী বলো ?

মা মুখটা গোমড়া করেই থাকেন , অনেক বয়স , বাত , কোমড় ভাঙা । প্রায়ই বলেন : সরকার থেকে ইচ্ছামৃত্যুটা বৈধ করলেই আমার ভালো হত । এইভাবে মৃত্যুর জন্যে দিন গোনা যে কী অসহ্য বেদনার আর মাঝখান থেকে তুই-ও বিয়ে করলি না ! শুনেছি ইউরোপে নাকি কোন দেশে ইচ্ছেমৃত্যুর একটি হাসপাতাল আছে । ওখানে সরকার এগুলি আইন করে দিয়েছেন যে যারা সত্যি চায়না বা খুব কষ্ট পাচ্ছে তারা মার্সি কিলিং এর পথ বেছে নিতে পারে । আমাদের এখানে কেন যে এরকম হয়না । জীবজন্তুর

মার্সি কিলিং হয় , মানুষের কি সমস্যা ? আর যদি দয়ামায়ার কথা বলে তাহলে পশুর প্রাণ নেবার অধিকারই বা মানুষকে কে দিয়েছে ? প্রাণ না নিলে কারোরই নেওয়া উচিৎ নয় !

এরই নাম বোধহয় জীবন । বা জীবন যন্ত্রণা ! সোমা একদিন হঠাৎ রক্তে বিষক্রিয়া হওয়ায় মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে মারা গেলো । কিসের থেকে এরকম হল কেউ জানেনা । পুরনো কোনো কাটা ঘায়ে হয়ত পচন ধরেছিলো খেয়াল করেনি ! ওদের মা নলিনী দেবী আজও বিছানায় শুয়ে থাকেন । এক মনে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকেন । একটি আয়া দেখাশোনা করে । মাথার একটু গোলযোগ দেখা দিয়েছে সোমা চলে যাবার পরে ।

- হায় হায় কপাল আমার , আমি নাকি যমেরও অরুচি !

কান্নাকাটি করেন একা একা । সামলাতে হিমসিম মাইনে করা আয়া । বড়ছেলে মায়ের ডাকখোঁজ আর করে না । তারা নাকি ভীষণ ব্যস্ত । ওদের সদ্য ১৮ বছরে পা দেওয়া সন্তান বাবা হয়েছে । বান্ধবী বার্বাডোজের মেয়ে- নাম হিনা ।

ওদের নাতি গ্যারান -ফুটফুটে সাদা নয় কুচকুচে কালো এক শিশু , মাথার চুল কালো কালো ঝুল লেগে থাকা , অপরিচ্ছন্ন ঝুল ঝাড়ুর মতন । তাতে কী ? ওরা একটুও দু:খিত নয় । ওরা এখন বিশ্ব-নাগরিক।

ওদের পরিবারে কালো, সাদা, বাদামী, গোলাপি, চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ , সোনালী চুল , নীল চোখ, কম চুল , দাঁড়ি কম সব রকমেরই মানুষ থাকবে ! ওরা বার্বাডোজে প্রাতরাশ সেরে প্যারিসে পোশাক পরে, তারপর চীনদেশে গিয়ে স্নান সেরে আবার কিছু খেয়ে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চা পান করে ! জেটসেট জীবন । সর্ব ধর্ম সর্বশ্রেনীর মানুষের সম্বনয় ওদের গৃহে , সংসারে ।

- অভাবনীয় , বলে ওঠে তমাল । দাদার কীর্তিকলাপ দেখে তারিফ না করে পারিনা ! পুরো অ্যাফ্রিকার জঙ্গল তুলে নিয়ে এসেছে বাড়িতে।।ওটা বাড়ি নাকি চিড়িয়াখানা ?
খিচুড়ি সংস্কৃতি আর নানান জিনের মিলনে কিছু চেতনার অদ্ভুত প্রকাশ এই মানব সংসারের নাম প্রগতি ? দাদা তো নিজেকে আজকাল আর বাঙালী বলেই মনে করেনা !

কিছুদিনের জন্যে বাসায় এসেছে জীববিজ্ঞানী, তমাল । সাথে নিয়ে এসেছে এক তুষার মানবকে । হরিয়ালি ইয়েতী এই প্রজাতির নাম । ওদের আবার ইয়েতী বললে ওদের মানহানি হয় । ওরাও মানুষ কেবল একটু বড় সাইজের । ওদের সংস্কৃতি আছে । সভ্যতা আছে । নিয়ম কানুন আছে ।
নিজেদের ইয়েতী বা মিশুর মতন রহস্যময় করে রাখতে চায়না বলেই সে এসেছে কলকাতায় । দেহে একটি ছোট যন্ত্র অপারেশান করে বসিয়ে এনেছে তমাল । তা থেকে শরীরের তাপ কন্ট্রোল হয় । ছোট্ট এয়ার কন্ডিশনার আর কি !

ওরা পাখি , হরিণ ও নানান ডিম খায় । হরিণ শিকার করে নারী ও পুরুষ পালা করে । যখন পুরুষ শিকার করে নারী ঘর সামলায় । আবার উল্টোটা । বরফের কুটির বানিয়ে থাকে । হরিণকে মেরে টেনে কিংবা কাঁধে করে নিয়ে আসে । মাংস পুড়িয়ে বরফের মধ্যে জমিয়ে দেয় । একটু একটু করে খায় । কাঁচা ডিম খেয়ে শরীরে বেজায় শক্তি হয় । বেশি তুষারপাত হলে ওদের গানের আসর বসে ।
সেখানে ওরা সব তুষারমানব ও মানবী বসে নানান পশুপাখির স্বর গলা দিয়ে বার করে- সেটাই ওদের গান । কেউ কেউ এমনি গলা কাঁপায় । তারা বিশেষ শ্রদ্ধেয় ।

তমালের স্ত্রী একটু বাচাল । বলে ওঠে : অত ঠান্ডায় খালি গায়ে বসে থাকলে এমনিই গলা কাঁপবে আর হু হু হু হু আওয়াজ বার হবে । এতে কী বিশেষত্ব আছে বুঝলাম না ।
তমাল ধমক দিয়ে ওঠে -- তোমাকে নিয়ে আর পারা যায়না ! ও শুনতে পাবে !
বাণী -- ও বুঝবে কী করে ও কী বাংলা জানে ? ও তো ইয়েতী ।
মুখে হাত চাপা দিয়ে দেয় তমাল ওর বৌয়ের ,তারপর গলা খাটো করে বলে -আরে বাবা ইয়েতী শব্দটা শুনে তো ও বুঝে যাবে যে ওকে নিয়ে আমরা আড়ালে আলোচনা করছি !

ইয়েতীকে ওরা শর্টে আদর করে ডাকে টি-এম বলে । তুষার মানব ।

টি-এম বলেছে যে ও দুজন মানুষের কথা জানতো । হার্জ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । আর তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারীর কথা আগে জানতো না । হার্জকে দেখার সুযোগ হয়নি । সুনীলবাবু খুব মিশুকে । রসিক । খুব আড্ডাবাজ । ওরা সানি বলে সম্বোধন করতো ওঁকে । উনি খুব বড় লেখক । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাথে খুনসুঁটি করা ইয়েতী কূলের ভালোলাগেনি । সূর্য একটাই আছে আমাদের বিশ্বে।
কারণ সূর্য একটাই যথেষ্ট । আর চাঁদের সংখ্যাও এক আমাদের বিশ্বে । অনেক গ্রহের বেশি চাঁদও আছে । সূর্যের তেজের সাথে চন্দ্রের মধুরিমার কি কোনো তুলনা হয়? দুটো দুরকম । তুষারমানবেরা যেমন চন্দ্র ও সূর্যের সাথে ব্যালেন্স করে বেঁচে থাকে । একটা কমবেশি হলেই ওদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে ।
এটাই ওদের উপলব্ধি সানির সম্পর্কে । উনি বেজায় ভালো ও মাটির মানুষ আর রসিকও বটে । উনি নাকি আমাদের ইয়েতী থুড়ি

তুষারমানবকে একটি পাহাড়ি গোলাপ দিয়ে অভ্যর্থনা করেন । ওকে পাহাড়ি গোলাপ বলেই ডাকতেন এই বিখ্যাত সাহিত্যিক ।

পাহাড়ের চূড়ায় আতঙ্ক লেখার সময় দেখা । ওদের ওখানে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন । বড় মাটির মানুষ । মনেই হয়না এত বড় লেখক ও কেউকেটা উনি ।

ওদের বরফের ঘরের নাম মিঙ্গারু । সেখানে সাফ সুতরো করে এক চৈনিক পুরুষ । ফিং ফিং ঝাউ । চোখ নাক মুখ প্রায় দেখাই যায়না ! তবুও ফিটফাট থাকে পুরো ঘরদোর মানে চোখে সবকিছুই দেখতে পায় আকারে ক্ষুদ্র হলেও ! তার হলুদ -গাঁদা বরণ । কাঁচা কাঁচা খায় সবকিছু ওরা যা খায় তাই । ওদের নাকি অভ্যাস আছে । জ্বালানি বাঁচে এতে আর প্রাচীন মানুষ তো কাঁচাই খেতো সব ।পরে রন্ধনের প্রণালী আবিস্কৃত হয়েছে । ওরা সেদিক দিয়ে মূল মানবজাতির সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে । কাজেই তুষারমানবদের খাদ্য গপগপিয়ে , রসিয়ে খায়।ভালই আছে সে।ওর সঙ্গিনী তুষার মানবী দ্রিউ (আদরের নাম) এই চৈনিক মানুষ ফিংফিং কে ধরে এনেছে চীনদেশের বর্ডারের কাছ থেকে ।

যারা পর্বত আরোহণে আসে অনেকেই নিঁখোজ হয় । আসলে ওদের টি -এম রা তুলে নিয়ে যায় বাড়ির কাজ করানোর জন্যে । ওদের পরবর্তী পেশা হয় ইয়েতীর বাড়ি চাকরাগিরি করা । হ্যাঁ , তুষারমানবেরা ওদের চাকরা বলে । অনেক পর্বতারোহীর জীবন বাঁচিয়ে দেয় ওরা । যারা তুষার ঝড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় । তাদের নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে ওরা বাঁচিয়ে তোলে সেবা শুশ্রুষা করে । অনেকে বলেনা : শৃঙ্গ জয় করেছে ? তাদের অনেকেই টি-এমদের স্নেহধন্য । তুষার মানবেরা তাদের সুবিশাল বপু নিয়ে খুব সহজেই অনেক পাহাড়ের চূড়ায় হাত পেয়ে যায় । তারপর মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেলে ওদের চূড়াতে বসিয়ে দেয় । আর ওরা বলে : শৃঙ্গ জয় করে এসেছি !

টি-এম হেসে বলে : তোমরা মানুষেরা হলে খুব বদমাইশ । আর ভীষণ মিথ্যে কথা বলো।কখনো কেউ বলেছে যে ওরা আমাদের সাহায্যে চূড়ায় উঠেছে ? খুব জোর বলা হয় কেউ কেউ আমাদের দেখেছে অথবা পায়ের ছাপ দেখেছে । তাই না ? তবে আমাদের সব থেকে বেশি বিরক্ত লাগে পশুপাখির রাইটস্ নিয়ে যখন তোমরা নিয়ম করো । আমরা জাত শিকারী । শিকার করে জীবন ধারণ করি । সন্তান-সন্ততিরা শিকারকে নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে অথচ তোমরা মানুষেরা শিকার বন্ধ করার খেলায় নেমেছো ! প্রকৃতির নিয়ম বদলাতে পারবে ? ফুড চেন না কী যেন বলো ?

তার কী হবে ? আর এত বনজঙ্গল কেটে বসতি করছো , আমাদের কথাও মনে রেখো একটু । পরিবেশের তাপে বরফ গলছে । আমাদের গরম লাগে , হাঁসফাঁস করি আমরা । তোমাদের কষ্ট হয়না ? তোমরা নাকি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সংবেদনশীল ? তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি সবখানে । কলকারখানা, কংক্রিটের বন ও হাইরাইজ করে ফেলছো । জানো এরজন্যে আমাদের ওখানে আকাশ থেকে লাল নীল মাছ পড়ে ? এমন এমন জীবানু পাহাড়ে এসেছে যা আমাদের দেহের জন্যে নতুন । অনেক তুষার মানব মানবী রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অকালে ।

ঐসব রোগের চিকিৎসা আমরা জানিনা । পাহাড়ে ওর ওষুধ নেই । তাই পাহাড় আর গান গায়না ! পাহাড় চুপ করে আছে । জানে না নিজ অস্তিত্ব রাখতে এবার উঁচু মাথাটা সমতলে মিশিয়ে দিতে হবে কিনা !

তমালেরা সবাই চুপ করে আছে । কারো মুখে কথা নেই । ও যা বলছে সেগুলি তো সত্যি । আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে , তাও সেটাও আজকাল অনেকে চায়না , যা ইচ্ছে করি । কেমিক্যাল ও বিষের ওপরে দাঁড়িয়ে সভ্যতা । কিন্তু নিউক্লিয়ার বোমার প্রতিযোগিতায় নামলে নিজ অস্তিত্ব সংকট দেখা দিতে পারে তা কি মানুষ বোঝে ? অথচ আমরাই নাকি সবর্পেক্ষা বুদ্ধিমান প্রাণী এই ভুবনে ।

কিছুদিন হল তমালদের বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে গেছে চিড়িয়াখানায় । কারণ আশেপাশের মানুষ উপদ্রব শুরু করেছিলো । পরে ওকে সুযোগ বুঝে পাহাড়ে দিয়ে আসা হবে । পাড়ায় নাকি একটা কিম্ভুত কিমাকার জীব এসেছে । যার নাম ইয়েতী !

সেদিন রাতে ডিনার টেবিলে বসে বাণীবন্দনা বলে ওঠে :: এতদিন আমরা একসাথে খেয়েছি । আজ টি-এম নেই । বাড়িটা এত খালি খালি লাগছে ।

ওর মনটা এত নরম দেহের সাইজ দেখে বোঝার উপায় নেই । এতদূরে এসেও নিজের সঙ্গিনীকে ভোলেনি । আর তুমি ? সারা বছর কটাদিন বাড়ি থাকো তার ঠিক নেই । বাড়িতে থাকা আর না থাকা সমান । হয় ল্যাপটপ কোলে নাহলে ল্যাবরেটরির বগলে বসে গবেষণার কাজ করো । বাইরে গিয়ে কি আমার কথা মনের কোণায়ও আনো ? আমি ভাবছি টি-এমের সাথে হিমালয়ে চলে যাবো । কোনো তুষার মানবের ঘরে কাজ করার জন্য আমাকে ধরে নিয়ে যাবে কেউ তুষারকণা ভেবে । আর তখনই ওদের সেন্সিটিভ মনের পরশ আরো বেশি করে পাবো। আমার জ্বর হলে সেবা করবে ঐ ইয়েতীটা ----

মুখ চেপে ধরে তমাল ----বলে -আগে মুখের ভাষা বদলাও , ওদের সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো তারপরে হিমের আলয়ে গিয়ে হিমলের ঘর আলো করো । ওর সামনে ইয়েতী বললে না তোমার ঘাড় মটকে দেবে ও । তখন ওর কর্কশ রূপটা দেখতে পাবে !

চটে ওঠে বাণীবন্দনা, চীৎকার করে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ----তবুও তোমার হিংসা হয়না তাই না ?

পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধা শাশুড়ি বলে ওঠেন : ছোটবৌমা , একটু আসবে ? সোমাটা যে কোথায় চলে গেলো !

রাতে বুড়ির ভীমরতি হয়। আয়া চলে যায় রাত নয়টাতে । তারপর বাণীই বাকি রাতটা সামলায় । সকালে অন্য আয়া চলে আসে । এইভাবেই চলছে । কদিন টি-এম বুড়ির সাথে জমিয়ে আড্ডা দিতো । মুখ দিয়ে নানা শব্দ বার করে । বুড়ি বলতো : চোখে কী আমার ছানি হল বৌমা ? এই মানুষটার গায়ে এরকম সাদা সাদা লোম কেন ? নাকি এ কোনো পশমের কোট পরে আছে ? বৌমা , ও বৌমা কোথায় গেলো সব !!

রৌদ্রছায়া

বাঙালী বাবা ও তার মেম মেয়ে । থাকে কলকাতার বাইপাসের ফ্ল্যাটে । মেয়েটির নাম ব্রাংকা । মা নাম রেখেছিলেন । মা বিয়ঙ্কা । বাবা হরিব্রত বিশ্বাস , শর্টে হ্যারি বিসওয়াস । মেয়ে ব্রাংকা বিসওয়াস । মা বিয়ঙ্কা বিয়ের ৩৫ বছর পরে মেয়ে ও স্বামীকে ছেড়ে চলে যান । আমেরিকায় । পেশায় ছিলেন প্রফেসর । পড়ানোর কাজ নিয়ে একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে যান । কারণ কোনো তিক্ততা নয় । বহুদিন এক স্বামী ও এক সন্তান নিয়ে বোর হয়ে গেছেন । এবার একটু স্বাদ বদল করতে চান । জীবন একটাই তো নয় কি? ওখানে গিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে করেছেন এক হাজারখানেক বছরের ছোট ছেলেকে । মানে ছাত্রকে । রাতগুলি দূর্দান্ত কাটে ! তখন টিচার ও স্টুডেন্ট নয়, পতিপত্নী । নগ্ন বুড়িকে অ্যামেরিকান স্ল্যাং বলতে বলতে আদর করে কিশোর স্বামী সদ্য ১৯ পার হওয়া চুয়িং ল্যাং । জাতে বোধকরি চীনা । বুড়ি Blow job- দেয় কিশোর স্বামীকে । চুয়িং গাম বলে এই প্রক্রিয়াকে । আদুরে গলায় বলে : তোমার সাইজটা খুব ছোট ।

চুয়িং হাসে । বলে : কজনের সাইজ দেখা আছে ? বর তো একজন ছিলো আগে আর বয়ফ্রেন্ড ?

বিয়ঙ্কা হেসে বলে : তোমায় বলবো কেন ? আমি প্রায় সবদেশেরই টেস্ট করে দেখেছি ।

এহেন বিয়স্কার মেয়েকে নিয়ে বাবা হ্যারি বিসওয়াস দেশে বসবাস করতে থাকেন । মেয়েটি খুব ভালো । খুব ভালো মেয়ে ব্রাংকা ।

দাঁতের ডাক্তার । দাঁত তোলা , সারানো, বসানো , পরিস্কার করা এইসব করেনা আর পাঁচটা অ্যাভারেজ দন্ত চিকিৎসকের মতন । সে সার্জেন । হিপনো সার্জারি করে । প্রথাগত ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান না করে হিপনোটাইজ করে রুগীকে অবশ করে দেওয়া হয় ।

তারপর দাঁতের অপারেশান হয় । অনেক সময় মাইল্ড কিছু সেডেটিভ ব্যবহার করা হয় ।

এই ধরণের অবশ করার অনেক সুবিধে । বিশেষ করে অনর্থক ওষুধ ঝামেলায় পড়তে হয় না । ব্রাংকার এই কারিগরী কুশলতার কথা পাড়ার অনেক লোকই জানে । কাজেই জানে ওপরের ফ্ল্যাটের তারা । তারাতোষ মুকার্জি । ব্রাংকার সাথে অনেকক্ষণ গল্প হয় । বিশেষ করে কোনো হিট ছবি দেখতে হলে তাও হলে গিয়ে তারাতোষের কাছ থেকে টিকিট পেয়ে যায় । টিকিট কাটার সময় কৈ ? তারা আজকাল ফ্রিতে টিকিট দেয় । ও সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করে । চরা দামে । ওর বাবা মনতোষ মুকার্জি দিল্লীতে একটি কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট । বাড়িতে আগে আসতেন । ইদানিং আর একেবারেই আসেন না । তবে নিয়মিত টাকা দিয়ে দেন ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে ।

তারা ওকে আগে ব্রাংকা বলেই ডাকতো । ব্রাংকার বাবা জীবন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে এখন ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন । একটি সংস্থায় কাজ করেন হেড হিসেবে । স্ত্রী তো চলে গেছেন- তবে কথা হয় । বিয়েতে মেয়ে ব্রাংকাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকা । কিশোর বরকে সাজানো তো উনিই

করেছেন । ফেরার সময় অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি । বলেছেন : ও খুব ভালো মেয়ে শুধু একটু রাগী আর খুব কম সময়েই বোর হয়ে যায় !

দুজনেই হেসে ওঠে ।

সম্প্রতি তারা ,ব্রাংকাকে বলেছে যে ওকে ভারতীয় নামে ডাকবে ।

-দেখো তোমার নামটি খুব খটমট । তুমি নিজে দাঁতের ডাক্তার তাই বোধহয় বোঝো যে এই নাম ধরে নিয়মিত ডাকতে গেলে কয়েকটি নির্ঘাত ভেঙে হাতে চলে আসবে । আর শর্টে ডাকার কোনো উপায় নেই এমনই নাম তোমার । ব্রা বলে ডাকা অশোভনীয় আর আংকা বলাটাও কেমন । কাজেই তোমাকে আমি যদি সাহানা বলে ডাকি তোমার কি কোনো প্রবলেম আছে ?

ব্রাংকা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেয় । ওর যা সুবিধে তাই ডাকুক তবে সাহানা নামটাই বা কেমন । ওর পদবী যে সাহা নয় সেতো সবাই জানে ও বিসওয়াস । বা বিশ্বাস । কিন্তু মুখে কিছু বলেনা ।

ধীরে ধীরে ব্ল্যাকার তারাতোষ ও ডেন্টিস্ট সাহানা প্রেমে পড়ে ।

ও কেন দাঁতের ডাক্তারি পড়লো জানতে চাওয়ায় ও বলে : দাঁত, মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ কিন্তু যতদিন সুস্থ থাকে আমরা ওর মর্ম বুঝিনা । বুঝি যখন ঘোরতর অসুস্থ হয়ে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায় । তাই আমার মনে হয় মানুষের দাঁত রক্ষা ও ভাঙা দাঁত ফিরিয়ে দেওয়ার আনন্দ, প্রাণ ফিরিয়ে দেবার চেয়ে কিছু কম নয় ।

অবসর সময় কাটায় সাহানা বই পড়ে । আজকাল লোকে অত বই পড়তে চায়না । ও কিন্তু সময় পেলেই বইতে ডুবে যায় । কতনা বিষয় জানা যায় বই পড়ে । মানস-ভ্রমণ হয় । ছুটির দিনে সিনেমায় না গেলে অথবা তারাতোষের সাথে প্রেম পর্বটা না থাকলে ও বই নিয়ে বসে । বাবা তো ভ্রূণ হত্যা নিয়েই ব্যস্ত । ওদের সংস্থার নামটিও আজব: কচিকাঁচাদের আমাকে দাও ।

- ড্যাড , এ একটা নাম হল ?
- কেন মন্দ কী , মাই চাইল্ড ?
- আমার ভালোলাগেনা । আর কে ভ্রূণ রাখছে কে রাখছে না সেটা তার প্রাইভেট ব্যাপার , তোমাদের কী ? ওদের প্রাইভেসিতে নাক গলাচ্ছো কেন তোমরা ?
- সে তুমি বুঝবে না । সবে ডাক্তার হয়েছো । এখনও দুনিয়ার দস্তুর জানতে অনেক সময় লাগবে ।

সত্যি দুনিয়ার দস্তুর বোঝা সহজ নয় । এই তো তারাতোষ ও শর্টে ডাকে টোট বলে তার পরিবারের গল্পই শোনো । বেদনাময় । ওর মাকে ছেড়ে দিয়েছেন ওর বাবা । প্রথাগত বিচ্ছেদ হয়নি । হয়ত হবেনা । বাড়িতে আসেন না । টাকা দিয়ে দেন নিয়মিত । ওরা একপ্রকার ভালই আছে । বাবা বিরক্ত । অত্যন্ত উঁচু পোস্টে কাজ করতেন বলে নিয়মিত পার্টিতে যাওয়া, লোকের সাথে মেলামেশা-করতে হত । ওর মা গ্রামের মেয়ে । মোটামুটি দেখতে । সুশ্রী । হাইট শর্ট । মায়েরা দুই বোন । মা করুণা আর মাসিমণি কামিনী ।

ওদের মাতামহ দরিদ্র দর্জি । গ্রামে দর্জির দোকান চালাতেন । হাত খুব ভালো । কোনো পোশাকের মাপ দিতে হলে ফিট হওয়া পোশাক দিয়ে এলেই উনি নিঁখুত বানিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন । মাপজোক করতে হতনা । ফিটিংস্ খুব ভালো হত ।

মেয়েদের বিয়ের অর্থ যোগাড়ের জন্য পাড়ি দেন এক দালালকে ধরে মধ্যপ্রাচ্যে । সেখানেও দর্জির কাজ করতেন তবে এক মুসলিম ব্যবসাদারের দোকানে ।

পেট্রো ডলার কামাতে আরম্ভ করেন কিন্তু আর দেশে ফেরার উপায় নেই, মুসলিম মালিক এক কাগজে সই করিয়ে নিয়েছেন । পয়সার জন্যে উনি সই করে দেন । নাই বা ফিরুন দেশে মেয়ে দুটি সুখে থাক । স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন । স্ত্রী ওঁর সাথেই থাকেন । কিন্তু ওদের আর দেশে ফেরার কোনো উপায় নেই । ফিরতে গেলে যেই পরিমান অর্থ ওকে দিতে হবে তা কোনোদিনই উনি রোজগার করতে পারবেন না ।

করুণাকে করুণা করেই বিয়ে করেন আই আই এম জোকা থেকে পাশ করা তারাতোষের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিতা মনতোষ । তখন অবশ্যই ম্যানেজার ছিলেন । একটি দরিদ্র মেয়েকে বিয়ে করে সমাজের উপকার করলেন আরকি । ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে অভিজাত সমাজের উপযুক্ত করার কিন্তু যা হবার নয় তা হয়না ।

স্ত্রী আবার এক ব্যামোর শিকার হন । উনি কোনো কাজকম্মো করেন না । অর্ধনগ্ন হয়ে শুয়ে থাকেন গামছা জড়িয়ে কেবল কারণ ওঁর মনে হয় উনি মরে গেছেন । তাই মৃতদেহ হয়ে শুয়ে আছেন । বিব্রত হন এখনো কেউ পোড়াচ্ছে না কেন ভেবে, এর পরে পচা গন্ধ বার হতে পারে ।

মনতোষ হাল ছেড়ে দেন । চিকিৎসক এর কোনো চিকিৎসা দিতে পারেন নি ।

এরকম গ্রাম্য ও অসুস্থ স্ত্রীর জন্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যতটা মনতোষের মতন আই আই এম- টপারের ওঠার কথা ততটা উঠতে পারেন নি । নিজের ওপরে বিতৃষ্ণা হত । কি দরকার ছিলো গরীবের মেয়ে বিয়ে করার ? ভালো কাজই তো করেছিলেন তার ফল এরকম উল্টো হল কেন ? অনেক অভিনেত্রীর কথা শুনেছেন যারা দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে । সবাই কি একরকম থাকে ? নিজেকে বদলাতে পারে এরকম মেয়েও তো অনেক । তাই একপ্রকার বিচ্ছেদ হয়েই গেছে । মানবতার খাতিরে টাকা দেন । একমাত্র পুত্রও অমানুষ হয়েছে । সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করে । পাস কোর্সে বিএ পড়তো তাও তিনবার ফেল করেছে । মনতোষ কোনোদিন ভাবেন নি তার রক্তে গড়া , তারই সত্ত্বার এক টুকরো এরকম বেহায়া ও অপোগন্ড তৈরি হবে !

এখন পাকাপাকিভাবে দিল্লীতে আছেন । দেহের ক্ষিধে মেটানোর জন্যে আছে এসকর্ট সার্ভিস । হাই সোসাইটির রূপসী মেয়েরা পকেট মানির জন্যেও করে । মনতোষ শান্তিতে আছেন । কোম্পানির অনেক শেয়ার পেয়েছেন । একা বেশ ভালই তো আছেন ।

তারা মাঝে মাঝে বাবার কথা বলে । ও যখন খুব ছোট তখন বাবা ওকে নিয়ে হিমালয়ে ঘুরতে যেতেন । কোনো লোকাল মানুষের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন । সেখানে ট্রাউট মাছ ধরতে যেতো ওরা । কখনো কখনো নানান ড্যামের ধারে গিয়ে মাছ ধরে আনতো । বাবা মাছ ধরতে খুব ভালোবাসতেন । বাড়িতে আনলে মা বাঙালী ধরণের রান্না করতো । তখন বাবার সাথে গোলমাল হত ।

বাবা বলতেন -- আমি মাছগুলি কষ্ট করে ছিপ ফেলে ধরি বেক করে বা রোস্ট করে খাবো বলে । আর তুমি এগুলিকে কালো জিরে , পেঁয়াজ রসুন দিয়ে নষ্ট করলে ?

মা মুখে মুখে কথা বলতেন না । চুপ করে থাকতেন । তার প্রতিটা কাজ বা স্বভাব অথবা আচরণের সমালোচনা শুনতে শুনতে হয়ত ওঁর মনে হতে থাকে যে উনি মারা গেছেন । নাহলে জীবিত মানুষের কোনো না কোনো কাজ তো তার কাছের মানুষের পছন্দ হবে !

তারাতোষের মাসি নিঃসন্তান । বিয়ে হয়েছে মুম্বাইয়ের দিকে এক ফিল্মি জগতের মানুষের একমাত্র পুত্রের সাথে । মানুষটির বাবা সিনেমার লাইটিং টেকনিশিয়ান কিন্তু মেসো বেকার । কোনো কাজ করেন না । তাই পাত্রী জুটছিলো না । গ্রামের মেয়ে কামিনীর সাথে বিয়ে দেন । ওদের দর্জি বাবা মেয়েকে সুদূর মুম্বাই যেতে দেন কারণ শ্বশুর মশাই গ্রামের ভালো ছেলে । কামিনী এমনিতে ভালই ছিলো শুধু স্বামী কাজ করে না এটাই যা দু:খ । তবে পরে সন্তানও হলনা । ওরা তো ব্রাহ্মণ । বাপের কূল ও শ্বশুর কূল । দুইপক্ষই । কিন্তু ওরা একটি সন্তান দত্তক নেয় লোকাল একটি সংস্থা থেকে যে সিডিউল কাস্ট । তাই নিয়ে শ্বশুর কিছু না বললেও শাশুড়ি ও অন্যান্যরা মুখর ।

আসলে নিজের গ্রামে দলিতদের ওপরে অত্যাচার দেখে দেখে এরকম ভাবে আত্মগ্লানি কাটানোর চেষ্টা করেছে মাত্র । ওর স্বামী ও শ্বশুর খুব ওপেন । উদার । ওদের এইসব জাতপাত শ্রেণী বিভাগের ব্যাপার নেই । আর ওর স্বামী যেহেতু রোজগার করে না তাই ওর দর্জি বাবার পেট্রো ডলারে ওদের সংসার চলে । কাজেই কামিনীর এক্তিয়ারে সবকিছু নাহলেও অনেক কিছুই আছে ।

বাচ্চাটি দুধের শিশু ওর আবার জাত নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? খুব ছটফটে ও মিষ্টি । রেলওয়ে স্টেশানের ওয়াশরুমে কেউ ওকে ছেড়ে যায় । একবছর বয়স হবে । গলার লকেটে কাগজ সাঁটা । তাতে লেখা ছিলো গোটা গোটা অক্ষরে, লাল কালি দিয়ে যে ওর জন্মদাতা ও দাত্রী সমাজের নিচুতলার মানুষ ।

অনাথ আশ্রম নিয়ে নেয় ।

ওরা নাম রেখেছে কাইফি । ওদের পদবি গাঙ্গুলি । কাজেই পুরো নাম কাইফি গাঙ্গুলি । লোকে অবাক হয় । তা হোক । ওদের কি কিছু যায় আসে ?

ওদের গ্রামে যা অত্যাচার দেখেছে তা কহতব্য নয় । দলিত মানুষেরা মন্দিরে গিয়ে, ব্রাহ্মণের ভোজের পরে ওদের এঁঠো শালপাতাগুলিতে খালি গায়ে গড়াতে গড়াতে যেতো পুণ্য হবার জন্যে । আশীর্বাদের জন্যে । আবার ছোটজাতের সন্তান হলে ওদের মন্দিরের ছাদ থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত । নিচে অন্য দলিতেরা লুফে নিতো । ওপর থেকে অর্থের বিনিময়ে ছুঁড়ে দিতেন মহামান্য ব্রাহ্মণ নামক একটি আজব জন্তু ।

যার গায়ে পরা থাকতো সাদা মোটা সুতলি যাকে ওরা বলে পৈতা !

কামিনী একটু মুখরা । ওর দিদি করুণা বলতো : এত কথা বলিস কেন ? চুপচাপ দেখে যা । মেয়েদের কাজ সব সহ্য করা । যে যা করে করুক তোর কী ?

কামিনীর ইচ্ছে করতো ঐ বুড়োব্যাটা ব্রাহ্মণগুলোর চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে পদাঘাত করতে । মনে হত বলে : এত আচার

বিচার পুজোপাঠ না করে নিজের উত্তরণের চেষ্টা করুন। আগে মানুষ হোন তারপর তো ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ বা দলিত ।

বলতে পারেনি সেদিন তাই আজ দলিতের সন্তানকে বুকে নিয়ে অপরাধ বোধের হাত থেকে কিছুটা মুক্তি চায় ।

টোটের জীবন কাহিনী বড় দু:খের । ও এখন আর ব্ল্যাক করেনা সিনেমার টিকিট । কিছুদিন সাহানার পরামর্শে ছোট দোকানে হিসেবের খাতা লিখতো । তার সাথে সাথেই সাহানা ওকে একটি কোর্স করিয়েছে । সেই কোর্স করে ও নিজে ব্যবসাদার হবার যোগ্যতা লাভ করেছে । স্মল স্কেল বিজনেস । সাহানা খুব পজিটিভ মেয়ে ,ওর বাবাও তাই । দূরদেশ থেকে মায়ের সাথে কথা হয় । মায়ের আবার নাকি ডাইভোর্স হয়ে গেছে । সেই কিশোর ছাত্র অন্য নারীতে গেছে । ইয়ং ছেলে একটি কতদিন আর টিঁকবে ?

মা এখন একা আছেন । মাঝে মাঝে ভারতে আসার কথা বলেন । সাহানাকে বলেছেন একটি ছোট ফ্ল্যাট দেখতে ওদের আশেপাশে । বাবাকেও আজকাল বেশ খুশি খুশি লাগে । মা আসবেন বলেছেন বলে ? কে জানে !

টোট তো এখন খুব ব্যস্ত । ও ছারপোকার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অভিনব মেশিন বাজারে এনেছে । বোতাম টিপে দিলে ভাইব্রেশান হয় খুব আস্তে তাতে ছারপোকার দফারফা । ব্যাটারি চার্জ হয় মানুষের গায়ের তাপেই । দামটা খুব কম রেখেছে বাজার ধরার জন্যে আর গরীব গুর্বোরা যারা বসতিতে থাকে ও ছারপোকার কবলে সবচেয়ে বেশি পড়ে তাদের উপকারের জন্যে আপাতত। বেড বাগ ব্যারিয়ার বিদেশে হয় । তবে টোটের বাজারে

আনা যন্ত্রটি বোধহয় ইউনিক । ওর বৌ ব্রাংকার মনে হয় । হ্যাঁ ব্রাংকা এখন আর বিসওয়াস নেই । মুকার্জি হয়েছে । সাহানা মুকার্জি ।

টোটের বাবা ওদের বিয়েতে এসেছিলেন । উনি বেশ খুশি মনে হল সন্তানের এই উত্তরণে । ব্রাংকাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে গেছেন । বলে গেছেন : তুমি যা পেরেছো আমি ওর বাবা হয়েও পারিনি । তুমিই ওর স্ত্রী ও বাবা-মা । ওকে দেখেশুনে রেখো । এই একটাই ছেলে আমার ।

টোটের মাও ব্রাংকাকে পছন্দ করেন । কিন্তু ওঁর কেবল একই কথা , আচ্ছা মা সাহানা ওরা কি ফুল খাটিয়া কিনে ফেলেছে ? ওরা আসছে না কেন ? এরপরে আমার দেহে পচন ধরলে আমি জানিনা ।

ব্রাংকার দুইচোখ বেয়ে জল পড়ে, দু:খে । তারাতোষ ওরফে টোট বলে : আমার দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে, এবার তোমরা দেখো ।

বিয়ে হল , সুখে আছে ওরা শুধু সাহানার সন্তান ধারণের উপায় নেই । ওর জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছে টিউমারের জন্যে।বিয়ের কিছুদিন পরেই । টোট কোনো অনুযোগ করেনি । টোট জীবন অনেক দেখেছে ।

কিন্তু ওর নিজের মা বিয়ঙ্কা জানিয়েছেন যে উনি নাতি বা নাতনির মুখ দেখতে বদ্ধপরিকর । কেউ আটকাতে পারবে না । তাই

প্রয়োজনে উনি নিজের জরায়ু দান করবেন মেয়েকে । বিদেশে এগুলো আজকাল হচ্ছে ।

মধুশ্রাবণী

মধুশ্রাবণীর নামটা যদিও খুবই শ্রুতিমধুর ও সত্যি মধু ঝরায় কিন্তু উচ্চারণ করতে একটু অসুবিধে, বিশেষ করে বিদেশীদের পক্ষে । কিন্তু মেয়েটি চোখ পাকিয়ে বলতো : আমার নাম মধুশ্রাবণী । ডাকতে পারলে ডাকবে নাহলে ডাকবে না। ঈশারায় কথা বলবে । মধু কিংবা শ্রাবণী বলবে না তো ! একদম বলবে না ।

ওদের বংশে ঐ প্রথম বিদেশে এসেছে । আগে কেউ আসেনি । এটা এমন কিছু অবাক হবার মতন ঘটনা নয় । যা হতবাক করে দেয় তা হল এই যে ওদের বংশে বেশিরভাগ মানুষই ইঞ্জিনীয়ার এবং যথেষ্ট তুখোড় ও ইনোভেটিভ । কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েনি । সবাই ডিপ্লোমা পাশ । যতই ভালো পরীক্ষার ফল হোক কিংবা বোর্ডে স্থান দখল করো না কেন পড়বে সেই ডিপ্লোমাই । আর কাজ করবে সরকারী অফিসে কারিগরী বিদ্যার একজন কর্মী হিসেবে । চড়বে মারুতি ৮০০ অথবা ভ্যান ।

কারণটা যথেষ্ট ভাবায় । ওদের পরিবারের মানুষের লজিক হল আজকাল চাকরী জগতে যথেষ্ট খেয়োখেয়ি ও র‍্যাট রেস । ডিগ্রী পড়লে সেই রেসে নামতে হয় । কারণ বড় চাকরি ও উচ্চপদের সম্ভবনা থাকে । ফলতঃ মেকি সমাজের আবর্জনা ও অহেতুক বিনোদনের কারণে দামী গাড়ি ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের ফলে মানুষ স্বচ্ছতা ও মনুষ্যত্ব হারাতে পারে । তাই ওরা কারিগর বলে নিজেদের , করে দূর্দান্ত কাজ কারণ জীবন দর্শন যাইহোক না কেন টেকনিক্যাল ব্রেনগুলি তো অতুলনীয় আর নানান গবেষণা করে নতুন নতুন যন্ত্র ও টেকনিক আবিষ্কার করে । ধনীদের

পারিবারিক সম্পত্তি থাকে যেমন প্রাসাদ সেরকম এদের পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে আছে একটি তিন পুরুষের পুরাতন গবেষণার ঘর ।

ওরা থাকে মুসারফনগরে । এই বহু পুরাতন আধা শহরটি আগে ছিলো আর্মির ঘাঁটি । আজ প্রায় ১০০ বছর কেউ আসেনা এইদিকে । বড় বড় পরিত্যক্ত আর্মি ব্যারাক , ভালো কোয়ার্টার , বিশাল চাতাল , গভীর কুঁয়ো , আগাছায় ভরা বাগান , ভাঙা মন্দির ও গীর্জা এবং পাথরের ছোট হাসপাতাল রয়েছে । পরে বহু গৃহহীন মানুষ অথবা অন্য রাজ্য থেকে কর্মসুত্রে আসা দরিদ্র মানুষেরা এখানে এসে জবর দখল করে বসে এই আবাসনগুলিতে । মধুশ্রাবণীর পরিবারও সেইরকমই এক পরিবার । দুটি ইউনিট নিয়ে ওরা বসবাস শুরু করে । ভাঙা গীর্জায় কেউ যায়না । মন্দিরটি সংস্কার করে পুজোপাঠ করা হয় । করে এই পরিত্যক্ত আর্মি ঘাঁটির বাসিন্দারাই ।

ভগবান যীশুর আরাধনা হয়না অথচ গীর্জা ঘরটি বিশাল । সেইখানেই গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে মধুশ্রাবণীর পূর্বপুরুষেরা গবেষণা করতেন । ওদের দুটি ইউনিটের একদম পাশেই এই ভাঙা চার্চ ।

ওদের বাড়ির মানুষেরা বলে : এমন কাজ করো যা অর্থপূর্ণ । কোম্পানীর মোটা মাইনের লোভ না করে গবেষণাগাড়ে কাজ করে মনের চাহিদা মেটাও ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে আর সমাজের জন্যে কিছু করে যাও ।

তাই বুঝি ওর এক দাদা অবসরে মাহুতের গান করে বেড়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে । লোকগীতি । আর অন্য দাদা নীলপাথরের পাখি

নির্মাণের যে শিল্প ওদের শহর থেকে হারিয়ে গেছে তা ফিরে পাওয়ার জন্যে কাজ করেন ও প্রচার করেন ।

সেই দাদার কথাই খুব মনে পড়ে আজকাল । ওর এক বন্ধু এইদেশেই আছে । সরকারের কর্মী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার বিদেশে পাড়ি দিলো ছয়মাসের জন্যে । তাদের পরিবারের কেউ কোনোদিন বিদেশে আসেনি । কাজেই চিন্তা তো হবেই পরিবারের মানুষের । তাই দাদার বন্ধু হেমাঙ্গ মিশ্র যে এখানে আছে সে খুব সাহায্য করলো মধুশ্রাবণীকে । ওদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলো । দুটি ভারি মিষ্টি শিশু , দুটি তাগড়াই কুকুর আর হেমাঙ্গ -দা ও ইন্দ্রানী বৌদি এই নিয়েই ওদের সুন্দর সাজানো বাংলো শিখিপাখা ।

সুন্দর ভারতীয় নাম । সেখানে থাকতে খুব মজা হত । হেমাঙ্গ-দা বলতো : আমিও তোর দাদার মতন একটু ক্ষ্যাপাটে আছি । তোর দাদার ব্রেন তো ফাটাফাটি কিন্তু পড়লো ডিপ্লোমা , কাজ করলো রেলের জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আর আমি এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়াই কিন্তু নানান সোসাল কজের জন্য কাজ করি যা করার আমার কোনই প্রয়োজন নেই । স্বামী স্ত্রী আমরা দুজনেই ইঞ্জিনীয়ার , তোর বৌদি আবার ডক্টরেট আমি ডিপ্লোমার পরে এ-এম -আই-ই করে এখানে এসেছি । যা ইনকাম করি তাতে সুইজারল্যান্ড , প্যারিস , অ্যাফ্রিকার গহীন বনজঙ্গল আর আলাস্কায় ঘুরে কাটাতে পারি কিন্তু সমাজের উপকারের ভূত মাঝে মাঝে চেপে ধরে ।

আসলে কিছুদিন আগেই হেমাঙ্গ-দা পুরো একমাস ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছে । হোমলেস মানুষের হয়ে চাঁদা তোলার জন্যে । পরিচিত মানুষেরা ও পথচারীদের দেওয়া অর্থ যোগ করে মোট ৫৩৮৭০ ডলার হয়েছে ।

- অনেক ; তাই না রে মিনি । মধুশ্রাবণীর ডাকনাম মিনি । কিন্তু সেটা খুব কাছের লোক ব্যাতীত কেউ জানেনা ।
মিনি হেসে বলে : অনেক মানে বিশাল । কিন্তু তোমার কষ্ট হয়নি ?
- হয়নি আবার ? বৃষ্টি বাদলাতে দোকানের সামনে শেডে গিয়ে শোয়া । রাতে গাড়ির শব্দ আর বালিশ ও তোষক ছাড়া শুধু চাদর ও হাওয়া বালিশে রোজ রোজ ঘুম দেওয়া আর দিনে হাড় ভাঙা খাটুনি , অফিসের কাজ --মাঝে মাঝে মনে হত, আর না থাক যথেষ্ট হয়েছে । পরক্ষণেই ভাবতাম , তাহলে যারা হোমলেস তাদের কত কষ্ট !

সারা বছর তো এইভাবেই কাটায় ওরা । শীতের রাতে , বর্ষায় বাদলে , হিমে ও প্রচন্ড তাপে । আর আমার তো মাত্র একমাস তাও সঙ্গে আছে খাবার ও বিছানা বালিশ ও প্রিয়জনের সঙ্গ । কাজেই শেষপর্যন্ত রয়েই গেলাম , কী রে একটু পাগল পাগল মনে হচ্ছে না ?

খুব জোরে ধাতব শব্দ করে হেসে ওঠে মধুশ্রাবণী । তারপর চোখ ছোট করে বলে : আমরা সবাই পাগল । যে যার নিজের মতন করে পাগল । একটু উন্মাদনা না থাকলে জীবনটা বড় ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে তাই না ? জীবনের আরেক নামই তো রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কী বলো ।

এইসব কথা হতে হতে ইন্দ্রানী বৌদি একটা গল্প শোনালো । ওদের বাপের বাড়ির দিকের একটা গল্প । বৌদি ,যাঁর কাজের বিষয় নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং উনি আজ ফাটাফাটি মাটন কাবাব , ফিশ বিরিয়ানি ও আলু বীরবল রান্না করেছেন । বিকেলে হবে কোরিয়ান

চাউমিন ও হংকং এর হাঁস ও তার চামড়া ভাজা । বৌদি নাকি জ্যান্ত অক্টোপাস খেয়েছেন । খেয়েছেন বাঁদরের ঘীলু , হ্যাঁ এটাও জ্যান্ত বাঁদরের । দাদা খাবার ব্যাপারে একটু কম রসিক । ঐ ডাল ভাত চচ্চড়িতেই চলে যায় । ওঁর খাদ্য হল স্ক্রু ড্রাইভার , পেরেক , ছুরি ইত্যাদি । মানে ডেডিকেটেড এক মিস্ত্রী ।

ওদের এক বিদেশী বন্ধুর স্ত্রী নাকি জুতো আর সোফার কুশন খায় ।

ওর একটি অসুখ আছে , স্নায়ুতন্ত্রের অসুস্থতা । নাম পিকা ।

বাড়ির সবাই খাদ্য খেলেও ***গেইলিরা গ্র্যাডেল গ্র্যাক্সো*** খায় অখাদ্য কুখাদ্য সমস্ত ।

গেইলিরার খাদ্যতালিকা শুনে মিনির চোখ ছানাবড়া ! সেদিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বৌদি নিজের গল্প আরম্ভ করলেন ।

চিত্ত নামক এক ব্যাক্তি ওদের গ্রামে নানান গাছে চড়ে রস পাড়তো । ঐ তারি অথবা নীরা হয়না সেইসব জোগাড় করতো । খুবই গরীব মানুষ । বৌ বাচ্চা নিয়ে সংসার । একদিন রেল কোম্পানী ঐসব গাছগুলি কেটে সেখানে রেললাইন বসালো । চিত্ত অনেক প্রতিবাদ করেছিলো সরকার শোনেননি ।

ওকে টাকা দিয়েছিলো রেল কোম্পানী । সেই টাকা নিয়ে বেচারি মূর্গীর ব্যবসা শুরু করে ওর বাড়ির মধ্যে । উঠোনে শুরু করে ধীরে ধীরে একটু একটু করে জায়গা ঘিরে নিয়ে ঘরের পাশেই গজিয়ে ওঠে ছোট পোলট্রি । ডিম ও মাংসের কারবারি চিত্ত । আগে গাছের রস আনতো । ছিলো রসরাজ । এখন পেটের দায়ে সেই মানুষই কসাই বনে গেছে । এও তো অ্যাডভেঞ্চারই !

কপালে সইলো না । কী কুক্ষণে কে জানে একবার চিত্ত, মূর্গীর মাংস সস্তায় বিলি করতে শুরু করে । লোকে কিনে নিয়ে যেতো । শেষে একজন কেউ কোনোভাবে বার করে যে মুর্গীর দল অজানা

রোগের কবলে পড়ে এক এক করে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে । তাই ঝিমিয়ে পড়লেই সেগুলো বাজারে ও ক্রেতাদের কাছে পাচার করছে একদা সরল সহজ আর এখন দুঁদে ব্যবসায়ী চিত্ত ও তার গেঁয়ো , হাঁটুর ওপরে কাপড় পরা বৌ যামিনী ।

পুলিশে খবর গেলো । কিন্তু কোনো কিছুই হলনা । মূর্গীর ব্যবসা চলতে লাগলো । একবছর পরে চিত্ত ওর পোল্ট্রি ও বৌ বাচ্চা সমেত অন্য গ্রামে পাড়ি দিলো ।
পুলিশ নাকি ওদের মোটা টাকা দিয়েছিলো মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ।

চিত্ত নাকি দেখেছিলো যে থানার পাশের লক আপ থেকে বহু অপরাধীকে চালান করা হয় বড় বড় হাঁড়ি করে অন্যকোথাও । তাদের হদিস আর পাওয়া যায়না ।
খবর নিয়ে জেনেছিলো যে ওরা এক ওষুধ কোম্পানীর গুপ্ত ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পৌঁছায় , ওদের মানুষ গিনিপিগের মতন ব্যবহার করা হয় । যেখানে ওদের শরীরে, ওদের অনুমতি বিনাই নানান সাইটো টক্সিক ড্রাগ পরীক্ষা করা হয় । বেশিরভাগই মারা যায় । যদি কেউ বেঁচে থাকেও তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় কড়া ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে । অর্থাৎ সমুদ্রতেই তার জলসমাধি হয় ।
পুলিশের বিবেক নাকি সাফ । ক্রিমিন্যালের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কি ? একটা ভালো কাজে জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ পেলো । এও কি কম ? নাহলে হয় ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে অথবা সারাজীবন ঘানি টেনে যেতো । কোনটা ভালো ?

জীবন কী অ্যাডভেঞ্চার নয় ? নয় কি রোমহর্ষক ? যা কিনা চিত্তর মতন হা-ঘরে কে করে বিত্তবান আবার সাইটো টক্সিক ড্রাগ যা আমাদেরই প্রিয়জন আর বংশধরদের মঙ্গলে লাগবে কখনো -তা

বাজারে আসার রাস্তা এমন নিপুন চালে তৈরি করে দেয় যা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবেনা ; নিঃসন্দেহে নৈশ অভিযানের তালিকায় আসে ।

-হিউমান রাইটসের লোকেরা ওদের ছেড়ে দিলো ? মিনির সরল প্রশ্ন ।

ইন্দ্রানী বৌদি কাপুচিনোর কাপটায় আবার কফি ঢেলে বলে ওঠে : আর তোদের হিউমান রাইটস্ ! ঐ গন্ড গ্রামে রাজনীতির চাঁইরা সব চালায় । ওদের পোষা কুকুর ঐ অফিসার , টাকার বিনিময়ে মানুষ ফেরি করে । কাজেই কেউ কাঠি গালতে পারেনা । চিত্তর আর কি? সে বিত্ত পেয়েই খুশি । ওর বৌ বাচ্চা তো আর পাচার হচ্ছে না । আর সত্যি তো হচ্ছে কতগুলি আসামী । তবে আসামীর শরীরে পরীক্ষা করা ওষুধ, নির্মল মানুষের শরীরে ব্যবহার করতে প্রেস্টিজে লাগবে কিনা তা আমি জানিনা বাপু । তবে রেল কোম্পানীও চিত্তকে যথেষ্ট মাথায় তুলেছে । ওর রুটিরুজির ওপর দিয়ে ওরা লাইন পেতেছে , তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে আবার ওর গাছের রস পাড়া মানুষ থেকে এক দুঁদে ব্যবসাদার হবার কাহিনী রেলের ছোট্ট মিউজিয়ামে ঠাঁই পেয়েছে । রীতিমত মডেল করে করে সেই গল্প ওখানে মিউজিয়ামের একতলার ঘরে বলা আছে । এক সাধারণ হতদরিদ্র মানুষ থেকে এই আভিজাত্যে উত্তরণের আরেক নামও তো জীবন । লাইফ । ইট্স্ মাই লাইফ !! লাইফ ইজ আ জার্নি লাইফ ইজ ড্রামা, লাইফ ইজ আ ব্লেসিং , আ লিটিল বিট অফ ট্রমা ।।

মিস্ত্রী দাদার স্বরচিত কবিতা । কবিতা আর ইঞ্জিনীয়ারিং দুটো একসাথে যায়না কে বলে ? টেকনোলজিও তো কবিতা , শুধু অ্যাভারেজ ইঞ্জিনীয়ারেরা সেটা জানে না ।

মধুশ্রাবণীর এক দাদা মাহুতের গান শিখেছে । আজকাল তেমন শোনা যায়না । ঐ দাদা চাকরি থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বিভিন্ন মাহুত-সঙ্গ করেছে । অনেক বনে বাদারে ঘুরেছে । অনেক মাহুতের মুখে নানান আজব গল্প শুনেছে ।

ওরা বলে সিংহ, জঙ্গলের রাজা । কিন্তু আকার ও ক্ষমতা দিয়ে বিচার করলে কিন্তু হাতিই জঙ্গলের রাজা । হাতি খুব বুদ্ধিমান ও মাহুতের কথা মানে । একবার এক মাহুত এক বনবালার প্রেমে পাগল হয়ে হাতির দেখভালে কিঞ্চিৎ ফাঁকি দেয় । এই পোষা হাতির দল বন থেকে গাছ উপড়ে কাঠ বয়ে আনতো কাঠগোলার কাছে ।

এক হস্তীবিশারদের মতে : নিজেদের অজান্তেই এই সুচতুর অতীব বলশালী প্রাণী অন্য আরেক বুদ্ধিমান জীবের অঙ্গুলি হেলনে নিজেদের বাসা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয় । বনজঙ্গলে কেটে সাফ করে ফেলে ।

দেখভালে ও আদরে ফাঁকি দিয়েছে বলে ওর পোষা আদুরে হাতি অভিযোগ জানায় ও শুঁড়ে তুলে আলগোছে নিচে ফেলে দেবার হুমকি দেয় ।

--ও আমার ফুলমালার অভিমান হয়েছে । বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নতুন একটা গান শোনায় মাহুত । রাগ অনুরাগ শেষ হয় ।
আরেক মাহুতের পোষা হাতি মারা যায় । সেপটিসিমিয়াতে । রক্তে বিষ ।

ওর একটি শিশু ছিলো । সে মায়ের মৃতদেহ ছেড়ে কিছুতেই নড়বে না ।
শেষে মাহুত গান শোনাতে গুটি গুটি সরে গেলো ।

গানগুলি প্রাণ ছুঁয়ে যায় । তবে মধুশ্রাবনীর দাদা বসন্তবাহার এইসব গান শুনিয়ে কোনো পারিশ্রমিক নেয় না । ঢোল , দোতারা ইত্যাদি বাজানো হয় গানের সাথে । গানের কলি বংশ পরম্পরায় মাহুতেরা শিখে নেয় । বাড়িতে চর্চা হত । বেশ একটা এথনিক এথনিক ভাব আসতো তখন । সেদিন বৌদিরা, ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারের বৌয়ের রান্না করা টিপিক্যাল এক বনমূর্গার ঝোল ও মোটাচালের ভাত রেঁধে সাজিয়ে বসতো । তারপর সবাই মিলে ফিস্ট হত । কিংবা বনজ খিচুড়ি । চালে ও ডালে মিশিয়ে - পেঁয়াজ রসুন ফোড়ন দিয়ে বুনো সবজি দিয়ে এক খিচুড়ি যা ভক্ষণ করা হয় লংকার আচার সহযোগে হয় । আচারে বুনো বুনো একটা গন্ধ থাকতো । কচু , মাশরুম, রাঙা আলু , সিম এইসব দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হত । পরিবেশকে মনে রেখে । মাহুতের গান মানে হাতি আর হাতির সাথে মনে আসে অরণ্য ।

একজন মাহুতের নাম ছিলো থাপা । সে জাতে পাহাড়ি । দেখতেও সেরকম । কম লোম শরীরে , কম্প্যাক্ট ডিস্কের মতন কম্প্যাক্ট দেহে হাত পা মাথা সব যথাস্থানে আর হলুদ রং ও লেপা পোছা মুখ । ছোট ছোট চোখ , নাহ্ ! থাপার কিন্তু একটাই চোখ । সেটা কপালের মাঝখানে আর সাইজে অনেক বড় । অদ্ভুত দেখতে হবে তাই না ?

সে মাহুত হল কী করে ? আসলে তাকে নিয়ে ছেলেবেলায় তার পরিবার অরণ্যে ঘুরতে যায় ও বনের ধারে গ্রামীণ মেলায় সে হারিয়ে যায় ।

ঐ মেলা থেকে এক মাহুত ও তার কিশোর ছেলে ওকে উদ্ধার করে । বাবা- মায়ের নামধাম কিছুই বলতে না পারায় ও মাহুতের সাথেই বসবাস শুরু করে । শুধু পদবী থাপা বলতে পেরেছিলো । তাই ওর নাম হয়ে যায় থাপা । আস্তে আস্তে সে শিখে নেয় হাতির বৃংহণের তাল লয় রাগ তান । মাহুতের গান ও হাতির পালন পোষণ । হাতির সাথী হিসেবে জমে ওঠে । সখ্যতা এতদূর গড়ে ওঠে যে রোজ রাতে মদ্যপ থাপাকে শুঁড়ে তুলে তার কুটিরের সামনে রেখে আসতো বন থেকে ধরে এনে পোষা হাতি জয়ন্তিয়া । মানুষ আর বৃহৎ আকারের তথাকথিত এক দূর্বার পশুর এই হেন মমত্ব মাখা সম্পর্ক দেখে বোঝা দায় কে কার হাতে সমর্পিত । এরকম নানাবিধ গল্প শোনা যায় মাহুত প্রেমী , বসন্তবাহারের কাছে , যা সত্য অথবা অর্ধসত্য ।

মধুশ্রাবণীর অন্য দাদার নাম নাগকেশর । সে কাজ করে অবসরে নীল পাথরের মূর্তি সংরক্ষণ নিয়ে । ওদের এলাকায় দরিদ্র মেয়েরা নীল পাথরের ছোট ছোট পাখির মূর্তি বানিয়ে লোকাল বাজারে বিকিকিনি করতো । আসলে শীতকালে তো নানান রঙীন পরিযায়ী পাখি আসে , ভুবন রঙে মেতে ওঠে । ওরা চলে গেলে বড় বেরং হয়ে যায় আঙিনা । তাই পরের বছর ওদের পথপানে চেয়ে মুর্তি তৈরি করতো গ্রামের মানুষ । স্থানীয় নরম প্রাকৃতিক এক পাথর যার রং তুঁতে , সেই পাথর দিয়ে গড়া হত সত্যিকারের নানান পাখির মুর্তি কিংবা কল্পনা করা কোনো অবয়ব । এই পাথর কেবল এই অঞ্চলেই পাওয়া যায় । নাম আসমানি । আসমানের মতন রং । তাই আসমানি ।

আসমানি পাথর খুব নরম তাই খুব সহজেই বিশেষ শক্তি ও দক্ষতা ব্যাতীত তাকে গেঁথে ফেলা যায় যেকোনো মনোলোভা আকারে ।
মেয়েরা সংসারের কাজ সেরে অলস দুপুরে এগুলি করতো । পরে বহু মহিলা করতে শুরু করে । বাজারে বিক্রি করে কিছু উপরি রোজগারও হত । তারপরে বেশ কিছু মাতাব্বর এগুলি শহরের দিকে চালান আরম্ভ করে । গ্রামীণ শিল্প ও ভাস্কর্য বিশেষ স্বীকৃত হবে বহুজনের মাঝে এই মনে করে ।
কিন্তু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং এই বিষয়ে পন্ডিতেরা প্রতিবাদ করেন । ফলে এই শিল্প পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় । আসমানি পাথর আজও মেলে । অনেক সময় মাটি খুঁড়ে নিজেরই বাগানে কিংবা উঠোনে-- কিন্তু সেই পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর হয়না ।

এই শিল্পের কদর করে অনেকেই কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে আবার তাকে লোক সম্মুখে নিয়ে আসা ও তার জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ কেউ নেয় না ।
মধুশ্রাবণীর পরিবার, বিশেষ করে ছোড়দা নাগকেশর এই ব্যাপারে আগ্রহী বলে একটি সংস্থা খুলেছে । সেখানে গ্রামের মেয়েদের আবার এই বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয় । ছাঁচ-গড়া ও তা থেকে সুন্দর সুন্দর মূর্তি খনন ,শেখান কিছু পুরনো মানুষ । যারা আগে এই কাজ দেখেছেন । আজ তারা খুব বুড়োমানুষ কিন্তু মনে আবার রং লেগেছে ।চড়া,উজ্জ্বল , ধাতুর মতন চক্‌চকে নীলপাথরে আবার বাণ ডেকেছে , তাই তো ওরাও খুব খুশি । নীল ঘূর্ণিতে অবগাহনের নেশায় । ওদের নেশা আজ হবে অন্য কারো কারো পেশা ।

নতুনদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করতে ও এই আর্মি পরিত্যক্ত আধাশহরের হারানো ঐতিহ্য পুনরায় ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার --বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখের অধিকারী ও নানান কারিগরী আইডিয়া-ভারে ন্যুব্জ ,নাগকেশর । যার ফণায় ছোবল নেই আছে আশ্রয় !

পরিবারের সবাই ডিপ্লোমা হোল্ডার । প্রতিটি মানুষই প্রতিভাবান কিন্তু ডিগ্রী নেই একটিও । ঝুলিতে সবার ডিপ্লোমা আর তাতেই তারা সবাই রাজা তাদের নিজেদের রাজত্ব -- ডিপ্লোমা ডকল্যান্ডে ।

পদ্মরেখা

পদ্মরেখা একটি সরু নদীর নাম, একটি রাজ্যেরও নাম যা কিনা নদীর তটরেখা ধরে বিস্তৃত।নদীতে জল খুব বেশি নেই । দুইপাড়ে, শীর্ণ স্রোতে ফুটে আছে অজস্র পদ্ম। পদ্মডাঁটায় বুঝি কালোভ্রমর! এই অঞ্চল ভারতের উত্তরে । এখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ । মেয়েরা সমাজের শিখরে । বিয়ের পরে ছেলেরা শ্বশুরবাড়িতে যায় । নারীবাহিনী বুঝি কুৎসিত পুরুষকে পার করতে মোটা পণও দাবী করে ।

পুরুষেরা কিছুটা পদদলিত । বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত । একটু বয়স বাড়লেই ক্ষেতে চাষ করতে নেমে যায় । মেয়েরা পরিবারের উপার্জনশীল মানুষ । বাবা ও ছেলেরা ক্ষেতে চাষ করে ও ঘরের কাজ করে । তবে নারীরা শ্রদ্ধেয় । তাদের কোমল মনের পরশে পুরুষ সব ভুলে যায় । বিশেষ কোনো বিতৃষ্ণা নেই কারো নারীদের প্রতি ।

এইরকম এক জায়গায় আছে লালঠাকুর । আজ তাকেই গাছের সাথে বেঁধে ঢিল , ইট ও পাটকেল ছুঁড়ছে মেয়েরা ।

এই মানুষটির জন্যেই আজ গ্রামে বেকারত্ব অনেক কমেছে । কাছেই আন্তর্জাতিক সীমারেখা । ভিনদেশ থেকে অনেক মাইগ্রেন্ট বেআইনি ভাবে এই রাজ্যে ঢুকে পড়েছে । স্থানীয় মানুষের চাকরি কমে যাচ্ছে ।ওদের সংস্কৃতিতে ছাপ ফেলেছে এই অন্যদেশের মানুষ যারা পুরুষশাসিত সমাজ থেকে আসছে ।

বেকারত্ব বেড়ে যাওয়াতে মানুষ মুষড়ে পড়ে । তখন লালঠাকুর একটি উপায় বার করেন । এখানে মাটি খুব উর্বর । উনি বলেন : যার যার বাড়িতে অল্প হোক বেশি হোক যা জমি আছে সেখানে পালা করে নানান সবজি চাষ করো । কে কী করবে স্থির করে নাও । তারপর বাজারে বিক্রি করো । তাতে একটি সবজির ভার একজনের উপরেই থাকবে অথবা একটি ছোট দলের ওপরে।

এইভাবেই কেউ ফুলকফি কেউ আলু কেউ পালং শাক কেউ বেগুন কেউবা ধনেপাতা ,কেউ পটলের মতন দেখতে ভেতরটা লাল এইরকম সবজি টিন্ডা আবার শালগম আর কেউ কেউ বরবটি , সিম এইসব চাষ করতে শুরু করে । স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে । যেহেতু কীটনাশক দেওয়া নেই ও ঘরের সবজির মতন টাটকা তাই লোকাল মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিনতে শুরু করে । অনেক বেকার কন্যা ও পুরুষের অন্ন সংস্থান হয় ।
রাজ্যের চাঁইরা লালঠাকুরকে সম্মানিত করে। ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত করে। আসলে ওনার নাম ছিলো লালচাঁদ পাইন ।
মায়েদের ও বোনেদের শাসনে বেড়ে ওঠা লালচাঁদ, নারীদের এমনিতেই যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতো । ওদের বাড়িতে ও একাই ছেলে । বাবা ব্যাতীত অন্যান্য সমস্ত সদস্য মেয়ে । তবুও মা যেন এই ছেলেকেই একটু বেশি স্নেহ করতেন । ওঁর মায়ের হাতে উল্কি ছিলো । লালব্যাটা লেখা । লালচাঁদ নিজের মাকে আদর করে -তুই- বলে সম্বোধন করতেন --
--মা তুই খাবার বাড় আমি একটা ডুব দিয়ে আসছি ।
--মা মুড়ি মাখ বেশ করে পেঁয়াজ , লঙ্কা , টমটম দিয়ে । (টমেটো)
--মা আজকে পান্তা ভাত , পোস্ত বড়া আর ইলিশের মাথা দিয়ে পুঁইশাক খাবো ! তাড়াতাড়ি কর ।

--মা , আজ রবিবার , ছুটির দিন । আজকে যদি মূর্গির মাংস করিস্ বেশ গোলমরিচ দিয়ে ? কেমন হবে ?
এইভাবেই লালঠাকুরের মা তার প্রিয় সন্তানকে সাজিয়ে তোলেন নানান আবদারের মালায় । মায়েরা বোধকরি সমস্ত সমাজেই একটু বেশি পুত্রপ্রেমী হন !

এখানে মেয়ে হয়ে জন্মালে পরিবারে উৎসব লাগে । ছেলে হলে মুখ ভার হয়ে যায় সবার । ধর্ষণ বলে কিছু নেই বরং মেয়েরা বহু পুরুষে যায় । এক একজনের তিন, চার, পাঁচটা এমনকি একডজন স্বামীও থাকে । পুরুষদেরকে নিজেদের রক্ষিত করে রাখা হয় । কেউ প্রতিবাদ করে না। ইদানিং কিছু পড়ালেখা শেখা পুরুষ প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হয় । কিন্তু চিড়ে ভেজে নি ।

লালচাঁদ মনে করতো কোনো মেয়েকে মনে মনে নগ্ন কল্পনা করাও পাপ ও পার্ভার্শান । অনেক পুরুষের মতন মেয়েদের শুধু শয্যায় কামনা করা তার মতে খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয় । আগে সবাই মানুষ তারপরে মেয়ে ও ছেলে । সবাই নিজ অধিকারে এই দুনিয়ায় আসে , থাকে ও খায় ।

বিয়ের পরে এই মুক্তমনা মানুষটি খেয়াল করে দেখে যে তার স্ত্রী পিরিয়ডের সময় বস্ত্র খন্ড ব্যবহার করে কিন্তু অপরিস্কার রেখে দেয় ।
বেশ কিছু বছর পরে, সন্তান হবার সময় একটি পচন ধরা, প্রজনন সংক্রান্ত রোগে বৌটি মারা যায় । চিকিৎসক জানান যে অস্বাস্থ্যকর কাপড়ের ব্যবহার এই রোগের কারণ । পেট পুরো ফুলে উঠেছিলো ! ঘায়ে সারা নিম্নাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়- মৃত্যুর সময় । যেন প্রজনন তন্ত্র গলে গলে পড়ছিলো , অসুখের উন্মত্ত আঁচড়ে ।

নানানভাবে খোঁজ করে, ব্যথিত লালচাঁদ জানতে সক্ষম হন যে ওদের রাজ্যে বেশিরভাগ মেয়েই এইভাবে বাঁচে । কেউ কেউ গাছের পাতা , নুন, নদীর পলিমাটি অথবা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করে । এই বিষয়টি একটি মিথ ও রহস্যে ঘেরা ,তাই কেউ আলোচনা করেনা এইসব নিয়ে ।

লালচাঁদ একটি স্যানেটারি ন্যাপকিনের ব্যবসা শুরু করে ।ওঁর প্রোডাক্টের নাম দেয় **রেশমি ধাগা** । দাম অনেক কম রাখে । দরিদ্র মেয়েদের ,মাঠে মেলা বসিয়ে ফ্রিতেও দান করা হয় । তাঁকে সাহায্য করে নিজ বোনেরা ও বন্ধুদের কারো কারো বোন ও স্ত্রী ।

--এত সুন্দর একটা জায়গা , পদ্মরেখা । নদীর দুইকূল ছাপিয়ে পদ্মের বন । এরকম জায়গায় মেয়েরা পার্সোনাল হাইজিনে এত পিছিয়ে কেন ? প্রশ্ন করে আনার হাবিব ।

আনার হাবিব একজন সমাজসেবিকা । এই রাজ্যে সব ঘরে পাকা কলঘর ও আবর্জনা নিস্কাশনের ব্যাপারে কাজ করতে এসেছে দিল্লী থেকে ।

লালচাঁদের নাম শুনেছে । বিবিসি ওকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছে -- ব্লাড ব্যারিয়ার নাম দিয়ে । লালচাঁদ বা লালঠাকুরকে আনারের বেশ ভালো লেগেছে । ভদ্রলোক খুব বিনয়ী ও নম্র আবার মেয়েদের দ্বারা চালিত বলে নেতিয়ে থাকা কিংবা ভীতু নন । স্বাধীন চিন্তাধারা আছে ও ঋজু মন । অনমনীয় চরিত্র । একটা ভালো ব্যালেন্স ।

আনারকে বলছিলেন, প্রথমবার স্ত্রী কিরকম মুষড়ে পড়েন পিরিয়ড নিয়ে গভীর আলোচনার সময় । নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ছে , দেহে জমছে দূষণ -সেটার থেকেও তার কাছে লোকলজ্জার ভয়ই বেশি । অথচ এরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে থাকে । লালঠাকুর কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে স্বামী অর্থাৎ

যার সাথে সেক্স করে মেয়েরা , তার সাথে পিরিয়ড নিয়ে আলোচনা করতে এত সংকোচ কিসের ? মেয়েদের স্বামীর কনসেপ্ট কি? বেটার হাফ নাকি টু -থার্ড ? শুধু বিছানার কাজ ,ব্যস্ ?

কথায় বলে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু । তাই কি ?
নাহলে স্যানেটারি ন্যাপকিনের ব্যবসা করা লালঠাকুরকে ,আইনিভাবে কারাগারে ঢোকাতে অক্ষম নারীবাহিনী ,পার্ভার্ট বদনাম দিয়ে বড় একটি গাছের সাথে বেঁধে, কুকুর -বেড়ালের মতন ঢিল মেরে , প্রাণনাশের এই বর্বর প্রথার দ্বারস্থ হয়েছে কেন ?

লালঠাকুরের কাজ তো তাদেরই ভালোর জন্য ।

যে উসকেছে, সেই নারী চন্দ্রাবলী ছেব্বাই এক ধড়িবাজ মহিলা । লালঠাকুরে কারখানায় কাজ নিয়েছে ন্যাপকিন তৈরির । তারপর নানান উল্টোপাল্টা যৌন-অত্যাচারের গালগল্প হেঁকে, সহানুভূতি কুড়িয়েছে মানুষের -বিশেষ করে সুবিশাল নারীবাহিনীর ।
তারপর লালঠাকুরকে অশ্লীলতার দায়ে ধরে, মহীরুহের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, সবাই মিলে ঢিল , পাথর , বড় বড় ইট ইত্যাদি ছুঁড়ে - শাস্তি দিয়ে হত্যার কৌশল নিয়েছে ।
আনার হাবিব লোক জড়ো করার চেষ্টা করে । কিন্তু কেউ এগোয় না ।
শেষে দিল্লীতে ফোন করে । পুলিশকে জানায় । পুলিশ কিছু করতে নিমরাজি । বলেঃ ওদের অন্দরের ব্যাপার ---নিজি মামলা ।

একজন মানুষকে, বর্বরতার চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়ে মারা হচ্ছে তাও এমন একজনকে যার দৌলতে রাজ্যে বেকারত্ব কমেছে -অথচ কেউ এগোচ্ছে না । ভয়ে । সবাই ভীত । পরেরবার তাহলে কি আমার নম্বর লাগবে -নারীবাহিনী ? পদ্মরেখা রাজ্যের পদ্মরাগমণিগণ ,যাদের পোশাকী নাম দেওয়া চলে পদ্ম গ্যাং ?

পদ্ম গ্যাংয়ের মেয়েরা মুখ চোখ ঢেকে সাইকেলে অথবা মোটরবাইকে যাতায়াত করে । রাস্তার মোড় থেকে রূপবাণ তরুণদের তুলে নিয়ে যায় নিজ অট্টালিকায় । যেসব পুরুষেরা ক্ষেতের কাজ করতে চায়না তারা অনেকেই এইসব কাজে নামে । মেল এসকর্ট ।

শেষপর্যন্ত লালঠাকুরের কী দশা হল আমরা জানিনা । কারণ আমরা এখন দিল্লীতে । মন্ত্রীদের কাছে যাবার প্ল্যান করছি ।

আনার হাবিব হিউমান রাইটস্ সংস্থা ও মিডিয়াকে জানিয়েছে । মিডিয়া পৌঁছে গেছে কিন্তু মানবতার বুলি আওড়ানো কেউ যায়নি । হয়ত যাবেও না। এক মহারথী তো বলেই দিলেন : আরে বাবা, ঐসব কাজ করার কী দরকার ? মেয়েরা কি ব্যবহার করবে তা ওদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার । একটা আউট-সাইডার উটকো পুরুষ, কী করে ঠিক করতে পারে কে কিভাবে তার পিরিয়ড ম্যানেজ করবে ? গ্লোবালাইজেশান না ছাইভস্ম !

বিদেশিয়া সভ্যতার করাল স্পর্শে এইসব আসলে পার্ভার্শনের নামান্তর মাত্র ! গ্লোবাল পার্ভার্শান । ওদেশের মেয়েগুলো রাস্তায় ল্যাংটা হয়ে নাচে । কেউ কেউ ট্রাউজারের ওপর দিয়ে প্যান্টি পরে ঘোরে । ওদেশে নাকি অনেক পুরুষ, স্রেফ মজা দেখার জন্যে স্যানেটারি ন্যাপকিন পরে ও ব্যবহার করে । ভারতে কী এসব ঘটে ? এখানে মেয়েরা লাজনম্রা ও হরিণের মতন তুলতুলে , আদর করার বস্তু । তাদের সবথেকে গোপন ক্রিয়াকর্ম, বাজারে নিয়ে

আসার মধ্যমণির জন্যে আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই । আর আমরা একে বিপ্লব মনে করিনা । মনে করি বেলেল্লাপণা । আর তুমি তো মুসলিম মেয়ে । গোঁড়া পরিবার থেকে এসেছো । তোমার মা তো বোরখা পড়তেন বলছো । তুমি এইসব বেলেল্লাপণায় নিজেকে জড়াচ্ছো কেন ? লেট দেম ডু ইট অ্যান্ড লেট হিম সাফার হিজ সিন্স্ ।

ইনফর্মেশান টেকনোলজি ও মাইক্রোচিপের অনুরাগে রঞ্জিত আধুনিক ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আনার হাবিব স্তব্ধ । কথা হারিয়ে গেছে । আঁখিপল্লব আর্টিফিসিয়াল সুগন্ধী চন্দনের পরশে বন্ধ ।চোখ দুখানি যেন জমে বরফ হয়ে গেছে । উন্নয়নের চমৎকার সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে দেখে ।

কাঠমানুষ

প্রফেসর বনানী কুমামল্লপাহাড়ি কোনোদিন ভাবেননি যে নামের মতনই একদিন উনি বনমানবী হয়ে উঠবেন। বাবা ছিলেন রাষ্ট্রদূত। নিজ যোগ্যতায় দূত হয়েছেন, কাস্টের ধ্বজা ধরে নয়। আসলে উনি, সমাজে জাতপাতের নাম করে সুবিধে নেওয়াকে অপছন্দ করে এসেছেন চিরটাকাল। বলতেন : মানুষকে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে ওপরে উঠতে হবে। শুধু সেটা দেখানোর প্ল্যাটফর্ম চাই। একলব্যর মতন না হয়।

বিয়ে করেছেন সহপাঠী ধনিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়কে।

প্রথমে অবশ্যই ধনিষ্ঠার মা বলেন :বেবী, শেষে এমন ছেলে বাছলে, যাকে খেতে দিতে গিয়ে আমার গা ঘিনঘিন করবে ? একটা লো- কাস্টের ছেলে ছাড়া আর কাউকে পেলেনা ? শুনেছি নাকি লড়াকু জাত। তোমার বাবা আর আমাকে দু -চারটে চড় থাপ্পড় মেরে দিলেও অবাক হবো না!

কিন্তু মুখোমুখি হবার পরে, ওঁর অপরূপ চেহারা, বিনয়ী ভাব ও সুমিষ্ট কথামালা -ধনিষ্ঠার মাকে মত বদলাতে বাধ্য করে। পরে মেয়ের কাছে ক্ষমাও চান। বলেন : আমরা বেশিরভাগ সময় না জেনেই অনেক কথা বলি ও জাস্টিফাই করতে থাকি !

সেই ধনিষ্ঠার কন্যা বনানী কুমামল্লপাহাড়ি। কুমামল্লপাহাড়ি মানে ভাড়া করা, লড়াইবাজ, পাহাড়িমানুষ বা লোক। ওরা টিলা মানে

ছোটপাহাড়ের মানুষ তাই পাহাড়িয়া অথবা পাহাড়ি যুক্ত করে প্রেস্টিজের জন্য । এই জাতের মানুষ খোলা তরোয়াল, চাকু , বাঁশের লাঠি ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে।কারো দরকার হলে ওরা অর্থের বিনিময়ে গিয়ে কয়েক ঘা কসিয়ে আসে।মেয়েরা কোমড় বেঁধে ঝগড়া করে আসে ।

মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা বনানী কোনোদিন নিজেকে ছোটজাতের মেয়ে ভাবেন নি । ওঁর কাজিনেরা বলতো : আজকাল তোরাই তো সমাজের শিখরে , আমরা ব্রহ্মণেরাই তো আজকাল আউটকাস্ট । কোটা করা উচিৎ আমাদের জন্যে ।

বনানী বিদেশে পড়াশোনা করেন, উদ্ভিৎবিদ্যা নিয়ে । দেশটির নাম ওয়েস্টোনা । খুব উন্নত দেশ । সহপাঠী মোগো কৈরির সাথে অনেকদিন একসাথে ছিলেন । বিয়ে হয়নি । একটি ছেলে হয় । নাম তূণীর । আজও বিয়ে হয়নি আর হবেও না কারণ মোগো কৈরি নিজদেশে ফিরে গেছেন আজ প্রায় ২০ বছর হল ।

কেন বিয়ে করেননি ,জানতে চাওয়ায় প্রায় সবাইকেই একইকথা বলেন : ভালোবাসার জন্য বিয়ের প্রয়োজন নেই আর আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম । যাকে আমি ভালোবেসেছি তার সঙ্গে দৈহিক মিলন না হলে আর কি প্রেম হল ? ওসব রূপকথার প্রেমে আমার কোনো বিশ্বাস নেই । প্রেম মানে উদ্দাম যৌবনের হাতছানি ,শরীরের সঙ্গম । মোহনায়, দেহের সাথে দেহ না মিললে ভালোবাসা হয় নাকি ?

আমার কাছে প্রেম মানে নারী ও পুরুষের পূর্ণতা যা একমাত্র দৈহিকভাবেই সম্ভব, সন্তানের প্রস্ফুটনে । এছাড়াও একজন মানুষের জীবনসঙ্গী খোঁজা উচিৎ, যার সাথে মনের মিল হয় । একজন বৌ কিংবা বর যা সমাজের পছন্দ হবে কিন্তু নিজের নয় এরকম মানুষ খুঁজে লাভ নেই বড় একটা । বিয়েটা একটা বিচিত্র অভ্যাস । দাঁত মাজার মতন ।

অদ্ভুত যুক্তি হলেও জীবনটা ওঁর নিজের কাজেই যুক্তি বাছাও ওঁর অধিকারের মধ্যেই পড়ে যতক্ষণ না কারোর ক্ষতি হচ্ছে চূড়ান্ত ।

মোগো কৈরি দেশে ফিরে যান একা কারণ ওর মতে ওদের সমাজে গিয়ে বনানী মানাতে পারবেন না । ওখানে মেয়েদের কোনো সম্মান নেই । ওদের লাথির কাঁঠাল বলে মানা হয় ।

মেয়েরাও এইভাবেই বংশ পরম্পরায় আছে কোণঠাসা হয়ে । নারীবাদী ফাদী ওখানে কেউ নেই । মেয়েদের কাজ সন্তান উৎপাদন করা আর রান্না করা । একজন পুরুষ একের বেশি মেয়েকে বিয়ে করেন কারণ এক স্ত্রীর পিরিয়ড হলে পুরুষমানুষটিকে যাতে অভুক্ত থাকতে নাহয় প্রতি রাত । তাহলে মানুষটি তখন বহিরজগতে দেহের শান্তি খুঁজতে যাবে ।

মেয়েরা ওখানে পরিবারের কাছে পুষ্পচয়নের মতন তাই ওরা একটু বুড়ো হলেই অথবা পৃথুলা ও রুগ্ন হয়ে ক্রমাগত ভুগতে থাকলে তাদের বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হয় ।

ওখানে পতিতারা বৃদ্ধা হবার আগেই , মেনোপজ হলেই মেরে ফেলা হয় অর্থাৎ একপ্রকার নিজেরাই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় । কেউ

প্রশ্ন করেনা । বিষ সংগ্রহ করাই থাকে । টুক করে খেয়ে শুয়ে পড়ে । কারো একটি স্তন ছোট ও অন্যটি বড় হলে স্তন কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় । সেই মেয়ে যুবতী থাকা অবধি বেঁচে থাকে । মধ্যবয়সী হলেই আত্মহত্যা করে । নাহলে এমন টর্চার করা হবে যে শেষঅবধি মৃত্যুই হবে ।

পতিতারা সাধারণতঃ সুন্দরী হয় । তাই মরার আগে বলে গেছে কেউ কেউ : কাল অবধি যার জন্যে পুরুষ ভোমরা পাগল আজ সে হয়ে গেলো ফেলনা ! বিচিত্র আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ।

সেরকম দেশে বনানীকে নিয়ে যাবার কোনো মানেই হয়না অথচ প্রেম আগুনের লেলিহান শিখা । পুড়িয়ে দেয় সব সংস্কার তাই কোল আলো করে আসে তূণীর । বনানী ছেলেকে নিয়ে দেশে চলে আসেন । মোগো কৈরি কোনো সম্পর্ক রাখেননি, নিজ দেশ লোলিটায় ফিরে গেছেন। লোলিটা শুনলে মনে হয় দারুণ উন্নত এক দেশ । আসলে ঠিক উল্টো । ওখানে যারা একটু এলিট তারা নিজেদের মেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে দেন । অনেক নিজেরাও চলে যান । কেউ কেউ নিজ জন্মভূমের টান অস্বীকার করতে অক্ষম তাই চূড়ান্ত অরাজকতা দেখেও থেকে যান ।

বনানী ওরফে সাহেবদের বিনি খুব করিৎকর্মা । প্রায় ১০০ টি নতুন প্রজাতির উদ্ভিৎ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওঁনার আছে । রেনফরেস্ট খুব গভীর হয় । সেখানেও কিছু গাছ উনি শনাক্ত করেছেন । এখন কাজ করেন প্যালিও-বটানিস্ট হিসেবে । প্রাগৈতিহাসিক গাছপালা নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করা কাজ । একটি বটানিক্যাল গার্ডেনের উনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন ও ওঁনার নামে একটি গাছের প্রজাতির নাম হয়েছে -- বনানী হেমা হেমিফোরা ।

এই গাছ প্রেমী মানুষটি এখন চাষ করেন । বিশাল জমি নিয়েছেন নানান পুরস্কারের অর্থ দিয়ে । টাটকা সবজি ও ধান ইত্যাদির ফলন হয় ঐসব এলাকায় ।

বলেন : বাজারের ফর্মালিন দেওয়া মাছ ও পেস্টিসাইড দেওয়া সবজি খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে । জীবনের অন্তিমে এসে তাই একটু টাটকা খাদ্য খেতে চাই ।

এই বয়সেও অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা । একাই সবকিছুর তদারকি করছেন । ক্ষেতখামারে ফলন হলে খুব আনন্দ হয় । যেন নিজের বাচ্চা এক একটি ফসল । আবার নিজ হাতে বীজ বোনা । আবার উজ্জ্বল ধান বা সবজির মেলা ।

সোনালী সর্ষে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় । আবার ব্রোঞ্জ রং এর গম ও কচি সবুজ পালং ও খয়েরি লাল শাকের বাড়বাড়ন্ত দেখে দেখেও আশ মেটেনা । বনানী তখন বটানিস্ট নন একজন শিল্পী ও ভাস্কর । যিনি নিজ সৃষ্টির প্রস্ফুটন দেখে দেখেও ক্লান্ত নন ।

এই নিয়েই আছেন । মোগো হারিয়ে গেছেন , মোগো কৈরি । ওয়েস্টোনা আর টানেনা বনানীকে, লোলিটাও নয় । একটা সময় লোলিটা দেশটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতেন ।

কোনো বই লেখেন নি উনি । কেন জানতে চাইলে বলেন : আজ পর্যন্ত কত বই তো লেখা হয়েছে ইতিহাসে । কিছু বদলেছে কি ?

কত বড় বড় জ্ঞানী গুণী পন্ডিত কত পথ দেখিয়ে গেছেন। কেউ মানে কি না ঐ পথে হাঁটে ? ওয়ার্ল্ডে আর পুস্তকের বোঝা

বাড়াতে চাইনা । আমি কাজে বিশ্বাসী । পুঁথিতে নই ।এই যে এত চাষবাষ করে যাচ্ছি ,উদ্ভিৎ বিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা এগুলি দেখেই বুঝবে আমি কী করতে চেয়েছি , সমাজকে কি দিতে চেয়েছি । আমার কাজ বই লেখা নয় । আমি লেখক নই গবেষক ।

ওঁনার বাড়িটি কাঠের কিন্তু রুচিপূর্ণ । ভেতরেও অনেক তাজা গাছ সাজানো । বলেন : সবুজের প্রলাপ ও বিলাপ দুই-ই শুনতে পাই দুবেলা এদের দেখে । প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক গাছ পুরোপুরি হারিয়ে গেছে বিবর্তন এর জন্যে আবার কেউ কেউ নিজেদের একদম বদলে টিঁকে গেছে আর তৃতীয় দল একইরকম রয়ে গেছে । তবে সংখ্যায় তারা অনেক কম । ঘরে এরকম কিছু গাছই ঠাঁই পেয়েছে আমার ।

গাছের প্রাণ উনি আর গাছেরা ওঁনার প্রাণ । গাছপাগল এই মানুষটির একমাত্র পুত্র তূণীর একটি গাছ হয়ে গেছে । বনানী বলেন : ঈশ্বর আমার বৃক্ষপ্রেমের তারিফ করেন । নাহলে ওকেই বা এই রোগে ধরবে কেন ? ট্রি-ম্যানস্ ইলনেস বলে একে সাধারণ ভাষায় । দেহ, গাছের মতন হয়ে যায় । দেখো গিয়ে ঐ ঘরে ।

লোকে গিয়ে দেখে- বসে আছে তূণীর । অর্ধ মানব । অর্ধ বৃক্ষ ।

লোক দেখলে জোরে শব্দ করে হেসে ,বলে ওঠে : উইকিপিডিয়াতে সার্চ করলে এইরোগের নাম পাবে, --Epidermodysplasia verruciformi , একটু খটমট নাম সন্দেহ নেই কিন্তু এই রোগ সত্যিই হয় । এটা কোনো কাল্পনিক অসুখ নয় । আর আমার মা এরজন্যে কোনোভাবেই দায়ী নন। অনেকে ভাবেন যে আমার মা জোর করে আমার গায়ে এতসব কাঠ, আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে আমাকে

কাঠমানুষ বানিয়ে রেখেছেন ; নিজের বনমাতাল স্বভাবের জন্যে । কিন্তু তা ঠিক নয় । আমি সত্যি অসুস্থ এক সন্তান তার। তবুও নয়নের মণি।সেটাও সত্যি ।

কাঠবাড়ি কাঁপিয়ে, ঠোক্‌রানো স্বরে হেসে ওঠে ঠাকুরাণীর পুত্র, উচ্চাঙ্গের কাঠমানুষ-তূণীর।একবার নয়, বারবার।বড় বায়বীয় সেই শব্দ , কাঠ ও হাসির সংঘাত । যেন গাছের কোটরে নোনা বাতাস খেলছে ।

জলতরঙ্গ

শিউলি সোমের বাবা সিনেমা হলের মেশিন-ম্যান । সিনেমা চালিয়ে দেখায় । আর মা ছিলো টিকিট চেকার । ওদের বাড়ি এক শহরতলিতে । একমাত্র মেয়ে পড়াশোনায় খুব ভালো । জীববিদ্যা নিয়ে পড়ে । তবে মেয়েটি খুব ভীতু ছিলো । লোকজনের মধ্যে গেলে হাত-পা কাঁপতো থরথর করে । রোগা ডিগডিগে, লিক্‌লিকে, পাটকাঠি।ওর বাবা বলতো : তুই জগতের শেষ রোগা । ওর নাম হয়ে গিয়েছিলো পাড়ায়- শেষ রোগা দিদি । ছুটির দিনে মেয়েকে মোটা করার জন্যে শহর কলকাতার নানান সরকারি হাসপাতালে বাবা ঘুরতো । মেয়ের সুস্থতার জন্য ।

এই রুগ্ন মেয়ের কি হবে ? ভেবে ভেবে বাবা -মায়ের কপালে গভীর রেখা দেখা গেলো অসময়ে ।

জীবনের আরেক নাম রথ । রথে করে কে কখন কোথায় পৌঁছায় তা জানেন কেবল বিধাতা । তাই বুঝি এই অত্যন্ত ভীতু মেয়েটি যে একা একপাও কোথাও যেতে অক্ষম ছিলো , বাসে -ট্রেনে চড়তে ভয় পেতো একা, সে একদিন প্লেনে চড়ে একা একা সোজা চলে গেলো বিদেশে , পড়াশোনা করতে । গবেষণা করতে, বলাই বোধহয় ঠিক ।

কাজ করতে করতে দেখলো ওদের বিভাগের বেশ কিছু মানুষ কুমিরের ডিম আনতে যায় বনে, জলাভূমিতে । একটি হেলিকপ্টার ওদের জলাভূমির কাছে নামিয়ে দিয়ে আসে ।

ওর ওঁৎ পেতে থাকে । কুমিরের অনুপস্থিতিতে ওর বাসায় হানা দিয়ে ডিম নিয়ে আসে ।সেই ডিম যায় কুমির ফার্মে । সেখানে ডিম থেকে শিশুর জন্ম হলে তাদের বড় করা হয় । তারপর ওদের চামড়া ব্যবহার করে ব্যাগ , জুতো , বেল্ট তৈরি হয় । অনেক সময়

কুমিরের মাংস বিক্রি করা হয় । ভক্ষণের জন্য । অনেক কুমির ,গবেষণার জন্যে নানান ল্যাবে চালান করা হয় ।

সেদিনের সেই ভীতু মেয়ে শিউলি সোম ,কুমিরের ডিম আনা শুরু করলো । জঙ্গলে গিয়ে, মার্টিন নামক এক সাথীর সঙ্গে, নিয়মিত ডিম সংগ্রহ করতে লাগলো । নেশায় ধরলো যেন । কিছুটা লোককে দেখাতে যে ও ক্যাবলা , বোকা ,আনস্মার্ট নয় । ও, আর পাঁচটা মেয়ের মতনই সাহসী ও যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ধরে । আর কিছুটা ভালোলাগায় । তাই জলের তরঙ্গে বাজে আজ আনন্দ সুর ।

জলের আড়ালে যদিও বিষ দাঁত শানিয়ে অপেক্ষা করে আছে অদ্ভুত এক জীব । যার পোশাকি নাম কুমির । ভয়াল আকার , শাণিত মুখগহ্বর , তেজোদৃপ্ত লেজের ঝাপটা নিমেষেই ফালাফালা করে দেয় মাংসল দেহ ।

বহুদিন ধরেই যেন অপেক্ষায় ছিলো কুমিরটা! একদিন বাগে পেয়ে , শিউলি ফুলে ছোবল বসালো । পদ্মবনে, সর্প ছোবলের মতন কুমিরের আক্রমণে ঝরে গেলো ,শেফালি ।

শিশিরে নয় জলস্রোতে- ঢেউয়ে শেফালি ঝরে যায় ! জলতরঙ্গ আজও বাজে । শুধু সুরের মূর্চ্ছনায় বিষাদের ছোঁয়া ।

শিউলি মারা যেতে ওর লিভ ইন পার্টনার ,হংসনাদ লাহা যার অশিক্ষিত বাবা তার নামকরণ করেছিলো গান্ধীজী -সেই ভদ্রলোক তার ও শিউলির কন্যা, রক্তজবা লাহাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে । হংসনাদ নিজের এই নামটি নিয়ে বহুবার বিপদে পড়েছে । লোকে হাসে , টিটকারি দেয় । কিন্তু নামটি সুন্দর , তাই না ?

লোকে বলে : এরকম ভজকট নাম না দিয়ে আপনার পেরেন্টরা নাম দিতে পাড়তেন প্যাঁক -প্যাঁক ।

এই বলে লোকে এখন ওকে প্যাঁক দেয় । হংসনাদ আর বলে না যে তার বাবার দেওয়া নাম আরো আজব । আসলে বাবা চেয়েছিলো তিন ছেলে ও দুই মেয়ের নাম বড় বড় মানুষের নামে দিতে, তাহলে হয়ত তারাও একদিন অনেক বড় হবে । কিন্তু বেচারা প্রায় নিরক্ষর হওয়ায় নামের বেড়াজলে পা জড়িয়ে , পা পিছলে যায় ।

গান্ধীজী , নেতাজী , স্বামীজি তিন ছেলের নাম আর মেয়ে দুজনের নাম মীরাবাঈ আর লক্ষ্মীবাঈ । হংসনাদ নিজের নাম বদলে এই নাম নিয়ে নেয় । অন্য ভাইবোনেরা পিতৃদত্ত নামই বহন করে চলেছে । তাদের কিছুই যায় আসেনা কারণ তারা ঘাসপোকার মতন বেঁচে আছে ।

রক্তজবাকে সবাই ডাকে জবা বলে । শর্ট ফর্ম । সে এখন একটি সংস্থা চালায় । নাম ফুমডি । এই ফুমডিতে , লোককে বন্যপ্রাণীর ভয়াবহতা নিয়ে জ্ঞানদান করা হয় । সংস্থার অর্থ জোগাড় করে হংসনাদ । সে তুখোড় ম্যানেজার । বিদেশে ম্যানেজারের কাজ করতো । গিয়েছিলো ব্যবসা -বাণিজ্য নিয়ে পড়তে । ভালো ফল করে ম্যানেজারের কাজ করতো । ৩০০ জনের ব্যাচে, মাত্র ১১জন ক্যাম্পাসে কাজ পায় । হংসনাদ তাদের মধ্যে একজন । সে ছাড়া আর কোনো এশিয়ান নেই । নজরে পড়ে মেধাবী শিউলির । মন দেওয়া নেওয়া তারপর একছাদের তলায় বসবাস । শিউলি, স্বেচ্ছায় কুমিরের দিকে গেলো । হঠাৎ যশস্বিনী হতে চায় ।হংসনাদ ,একটি কোম্পানিতে কাজ নিয়েছিলো তারা মানুষের মৃত্যুর পরে চিতাভস্ম নিয়ে খোলা জমিতে ছড়িয়ে দেয় । সেখানে ফুলের চাষ হয় । পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে এইরকম ব্যবস্থা । আর আমরা তো প্রকৃতির কণায় তৈরি । তাই বুঝি ফিরিয়ে দেওয়া হয় আমাদের দেহকণা সেই মাটিতেই । বপণ করা হয় আরো নতুন প্রাণ সেই মাটি থেকে । বেঁচে থাকি আমরা একপ্রকার ফুলের মাঝেই ।

সেই কোম্পানির কাজ নিয়ে আবার কিছু মানুষ প্রতিবাদ করেছেন । কারণ চিতাভস্ম একটি সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার । সেটা ঐভাবে

বারোয়াড়ি জমিতে ছড়ানো উচিৎ কিনা সেটা ভাববার বিষয় । কাজে কাজেই !

শিউলি তো ঝরে পড়লো কুমিরের আখড়ায় ! হংসনাদ ও রক্তজবা দেশে ফিরে অন্য কাজ নিলো । তিনজনের জীবন এক কালো রাতে হঠাৎ-ই বদলে গেলো । ভোরের স্পর্শে ,তিনজন তিন জায়গায় । তিন অধ্যায় শুরু হল আবার ! বন্যপ্রাণীর সান্নিধ্য খুবই রোমহর্ষক ও বিরল অভিজ্ঞতার খনি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বন্যেরা বনেই সুন্দর । অহেতুক তাদের ডেরায় হানা দিলে, তারা বিরক্ত হতে পারে ও আক্রমণ করলে তাদের দোষ দেওয়া যায়না । তারপর নিজ মায়ের কাহিনী মেলে ধরতো ,মেম্বারদের সামনে । রক্তজবা বা সংক্ষেপে জবা ।

বলতোঃ সাহস দেখানোর জন্যে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করার দরকার নেই । জীবনে নানান দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া ও বিভিন্ন কুসংস্কারের হাত থেকে নিজেকে দূরে রেখে সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষের সামনে একটি আদর্শ রেখে যাওয়াও সাহসিকতার পরিচয় দেয় । আমার মা যে বিদেশে, একাকিনী মহিলা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিলো ও গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলো সেটাই যথেষ্ট । চূড়ান্ত বিপদের মুখে নিজেকে অহেতুক ঠেলে দিয়ে মৃত্যুবরণ করা হয়ত তেমন ভীতু মানুষের কাজ নয় আবার তা খুব একটা কাঙ্খিতও নয় ।

জবার মা শিউলি যেই মার্টিনের কাছে কুমিরের ডিম সংগ্রহ শিখেছিলো সেই মার্টিন আসলে আদিবাসী । ওদের জাতের নাম খাম্বাসা ।

এই খাম্বাসা জাত একটি অদ্ভুত জাত । ওদের মধ্যে কে কেমন মানুষ তা তার মুখ দেখলে অচিরেই টের পাওয়া যায় । ওরা ওদের মধ্যে যারা খুব প্রতিভাবান অথবা সৎ আত্মা তাদের এবং যারা অতি নীচ ও নিকৃষ্ট চরিত্রের তাদের- সবার মুখে উল্কি এঁকে দেয়, আজকাল যাকে বলে ট্যাটু । সেই ট্যাটুর বিষয় সুন্দর হয়

অথবা কুৎসিত । সমাজ যাদেরকে রত্ন ভাবে তারা সুন্দর উল্কি পায় আর যারা নষ্টমানুষ তারা পায় কদর্য উল্কি । কাউকে না স্পর্শ করেই কেবল তার এনার্জি বডির চিত্র দেখে বিশেষ কিছু মানুষ, ওদের কাছে যারা প্রিস্ট তারাই এই উল্কি বানায় ।

যাদের এনার্জি বডিতে খুব একটা বিশেষত্ব নেই , না আছে পজিটিভ না নেগেটিভ তারা গড়পরতা মানুষ । তাদের কোনো ট্যাটু হয়না । ওদের প্রজাতির জন্যে তা কিছুটা অসম্মানসূচক । আসলে সবাই পজিটিভ উল্কিরই ধারক ও বাহক হতে চায় কিন্তু এখানে ঘুষ দেবার উপায় নেই । লাইনে, কিছু প্রিস্টের সামনে দাঁড়িয়ে এনার্জি পরীক্ষা দিতে হয় । যজ্ঞের শিখার সম্মুখে দাঁড়াবার মতন । হোমশিখার স্পর্শে পাপস্খলন হবে । সেরকম প্রিস্টের দৈবশক্তির পরশে মানুষ উত্তম অথবা অধম উল্কির অধিকারী হবে । মার্টিনের কোনো উল্কি ছিলোনা । তবুও সে এই ভয়ানক কাজে অংশ নেয় ।

তাকে কি গড়পরতা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ?

স্তবক

মাঝরাতে হঠাৎ একটি গুলির শব্দে আমরা লাফিয়ে উঠি । গুলিটি আমাদের বেডরুমের পাশেই করা হয়েছে । বাড়ির বেডরুম সামনের দিকে । তার আগে একটু বাগান । সেখানে কচি কচি সতেজ সবুজ ঘাস । তার পাশেই একটি বড় লাল ফুলের ঝাড় । গুলি ওদিকেই করেছে ।

--ইয়া ওবিনি ইয়া আরুনি ! চীৎকার ভেসে আসে ।

আমরা শোবার পোশাক ছেড়ে বাইরের পোশাক পরে বার হতে না হতেই এসে গেলো পুলিশের গাড়ি । অনেকগুলি । তারপরে লাশটিকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হল । পুলিশ প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে ঢুকে অত রাতেও নানান প্রশ্ন করে তদন্ত শুরু করলো ।

পরেরদিন সকাল থেকে মাথার ওপরে পুলিশের হেলিকপ্টার চড়কি পাক দিতে থাকে । পুরো পাড়া সিল করে দেওয়া হল । বাইরে যেতে হলে অথবা ঢুকতে হলে পুলিশের পার্মিশান নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে ।

নিহত হয়েছে মিহিং পাখাম ।। আমাদের পাশের বাড়িতেই ওর মা থাকতেন দুই ছেলেকে নিয়ে । আমি মিহিং পাখামকে ব্রাদার বলে ডাকতাম । আমি পুতুল চট্টরাজ এখানে থাকি । এই পাড়ায় । ড্রাইডিং দেশের এক শহরতলি ।

ব্রাদারেরা ১৫ ভাইবোন । সবাই এই ড্রাইডিং দেশবাসী আজ প্রায় ৩০ বছর । এই বাড়িটাতেই বেড়ে উঠেছিলো ওরা সবাই । এখন বেশিরভাগ ভাইবোন বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে । ওদের মা ,যাকে আমি মমি বলি উনি আমাকে নিজ সন্তানের মতনই স্নেহ

করেন । সেই ভদ্রমহিলার নাম ওড়নিভা । উনি এইসব ছেলেপুলেদের মানুষ করেছেন একা হাতে । বাবা থাকেন সুদূর দেশ, পিলুঘসেটির শিকাকা শহরে ।

অনেক জমিজমা ওদের । ওখানে ভদ্রলোক নিজ খুড়তুতো বোনকে বিয়ে করে আছেন । ওদের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা আছে । কাকা কাকিমা নিহত হন দূর্ঘটনায় । সবচেয়ে ছোট মেয়েকে একা না ফেলে রেখে উনি বিয়ে করে নেন । ওদের কোনো সন্তান নেই । মেয়েটি, সমাজের আর পাঁচটি কুচক্রীর গঞ্জনার ভয়ে স্বামীর সাথে বসবাস করেনা । আলাদা , অন্য মহলে দাসীবাঁদি নিয়ে সুখে থাকে । যেন কোনো দয়া নিতে চায়না । মহল ও দাসী সবই ওর বাবার সম্পত্তি অর্থাৎ ওর স্বামীর কাকার । স্বামী বা দাদাও অদ্ভুত । রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন- পাগল সেজে থাকেন । সুস্থ মানুষ, পাগলের অভিনয় করে যান কারণ বর্তমান দুনিয়ায় এইরকম হয়ে থাকাই সুস্থতার লক্ষণ । পড়শি দুই দেশের সাথে ক্রমাগত লড়াইতে ও গৃহযুদ্ধে পিলুঘসেটি দেশ কুপোকাৎ । শিকাকা শহরটি ভারি সুন্দর । পৃথিবীর স্বর্গ । কিন্তু যুদ্ধে লোকক্ষয় ও লোকবলের অভাবে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ।

প্রথমে ড্রাইডিং দেশে চলে এসেছিলেন । বছর ছয়েক ছিলেন । কিন্তু আর ভালোলাগেনি । ফিরে যান দেশে । ছেলেমেয়েরা বা স্ত্রী যেতে রাজি হননা ঐ রক্ষণশীল সমাজে । ওরা থেকে যান । পিলুঘসেটি থেকে টাকা পাঠাতেন । মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতেন ।

মেয়েগুলি অসম্ভব রূপসী । রূপ যেন ফেটে পড়ছে । মমিকেও খুব সুন্দর দেখতে তবে বয়স হয়েছে আর এতগুলি ছেলেপুলের মা কাজেই চেহারাতে একটু শুকনো ভাব চলে এসেছে । তবুও সুন্দরী । অনেকটা পুরনো অভিনেত্রী নার্গিসের মতন মুখ । মমির স্বামীও রূপবাণ । রেভারেজ নাম ওঁর । লম্বা চওড়া মানুষ । মাথায় অবশ্যি একটু টাক পড়ে গেছে । ভদ্রলোক, পাগল সেজে থাকেন শুধু শিকাকা শহরে বা পিলুঘসেটি দেশে । এখানে উনি পূর্ণ সুস্থ । মেয়েগুলির খুব ভালো বিয়ে হয়েছে । রূপ আছে , খুব

ভদ্র ও নম্র তারা । আর মাথা ভর্তি মেঘবরণ কেশ । সবাই ওদের নিজেদের জাতে বিয়ে করেছে । ওরা ঘাউড়ি নামক এক ধর্মের মানুষ । উপাসনা করে প্রকৃতিকে । বাজপাখি , হাতি ও প্রাগৈতিহাসিক কাছিম বিশেষ উপাস্য ।

ওদের বাড়ির সামনে সবসময়ই ফ্যান্সি সমস্ত গাড়ি দেখা যায় । দামী ল্যাম্বর্গিনি , বুগাটি , মাজেরাটি , হ্যামার , বি এম ডাবলু কি নেই !

মমির দুইছেলে, যারা ওর সাথেই এখন থাকে, তারা দুজনেই উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে । মেয়েরা বিবাহিতা । আর দুই ছেলে আলাদা থাকে । তারা নাকি চকোলেটের ব্যবসা করে । চকোলেটের ফ্যাক্টরি আছে । কিন্তু সেই ব্যবসা থেকে কি এত টাকা আসে যে এইসব ফ্যান্সি কারের মেলা বসানো যায় ভেবে একটু অবাক লাগলেও পড়শিরা কেউ কোনো প্রশ্ন করেনা । আসলে মমির দরদভরা গলায়, ওদের দেশের ফোক সং শুনলে কেউ কিছু সন্দেহই করবে না । ওড়নিভা নামক এই বৃদ্ধা ,অসাধারণ গান করেন । গানের জলসাও করেন । ফেসবুকে একটি পাতাও খুলেছেন ।

আমি ওর বড় ছেলেকেই ব্রাদার বলতাম । সেই ছেলেই নিহত হয়েছে । মিহিং পাখাম । আমার পার্টনার বা স্বামী একজন মুসলিম মানুষ । ওর নাম মজিদ ।ও সবসময়ই আমাকে প্রশ্ন করতো ওদের অথেনটিসিটি নিয়ে ।

কেউ কোনো কাজ করেনা , ওড়নিভা শুধু গানের জলসা করেন তাও ওদের দেশের ফোক সং । যতই লোক জমায়েৎ হোক ল্যাম্বর্গিনি বা মাজেরাটি কেনা যায় নাকি এতই সহজে ?

আমি অত মাথা ঘামাতাম না । এই দুনিয়াই অনেক কিছুই ঘটে । আশ্চর্য হবার মতনই, ঘটনার ঘনঘটা চারদিকে । কিন্তু যেখানে

চোখ বন্ধ করে থাকার দরকার, সেখানে আমি সেইভাবেই থাকি । নাহলে ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে ।

মিহিং পাখামকে কে এসে রাত ২টোর সময় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারলো তা এখনও তদন্তের আওতায় । মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে । অনেকেই বলছে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ ছিলো তাই মারা গেছে । গ্যাং ওয়ার । কিন্তু কিছুই প্রমাণ করা যায়নি । অনেকে বলছে যে এই পিলুঘসেটির মানুষ খুব অ্যাগ্রেসিভ ও ইগো সম্পন্ন । ওদের মেল ইগো সংঘাতিক । কেউ ওদের অপমান করলে, মেরে ফেলে । আবার পাল্টা মার খায় ,আবার অন্যজন মারে । এইভাবে নানান প্রতিষ্ঠিত পরিবাবের মধ্যে ছোটখাটো যুদ্ধ লেগে থাকে । ওরা মেয়েদের দমিয়ে রাখে । আগে বাড়ির বাইরে যেতে দিতো না । নিজেদের দেশের নানান যুদ্ধে ও গৃহযুদ্ধে বহু পুরুষ নিহত হয় ও অনেকেই দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় । লোকবল কমে যাওয়াতে এখন ওরা মেয়েদের কাজে লাগায় অর্থাৎ বহিরজগতে তারা পদার্পণ করতে পারে ও কাজকম্মো করে খায় ।

ওদের দেশে যারা নম্র ও বিনয়ী ,তাদের দূর্বল মানুষ বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় ,সমাজে । সেই পরিবারের কারো সাথে ছেলেরা বিয়েশাদি করেনা ।

ওরা একটু যুদ্ধং দেহি মানুষ পছন্দ করে ।

মিহিং পাখাম বা ব্রাদার , মমি বা ওড়নিভা ও অন্যান্য সন্তানেরা কিন্তু খুবই বিনয়ী । হয়ত এই দেশে আছেন বলে ।

মিহিং পাখামের তিন বৌ । তিনজনই এখানে আছে । রূপ বেয়ে পড়ছে ।

সবমিলিয়ে আটটি সন্তান । সবার আমি পিসি হই । নিজের এখনো কোনো বাচ্চা নেই, মজিদ এখন ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত তাই । তো এই ভাইপো -ভাইঝিদের নিয়েই আমার বেশ কেটে যায়। আর একসঙ্গে

তিন তিনজন বৌদির আদর খেতে খেতে আমি কাহিল । অত রাতে ব্রাদারের, মমির কাছে কফি খেতে আসা কোনো নতুন জিনিস নয় । এমনিতেই ওরা লেট নাইট পার্টি করতো ও খুব নয়জি । কিন্তু মানুষগুলি উপকারি ও বড় ভালোমানুষ সবাই, তাই কেউ কিছু মনে করতো না ।

ওরা বলতো : আমরা এতগুলো ভাইবোন প্লাস তাদের বৌ বাচ্চা ও বরেরা মিলেই অনেক লোক হয়ে যায় আর বন্ধুবান্ধবদের বললে আরো অনেক --কাজেই একটু হল্লা, চেঁচামেচি তো হবেই ।

ব্রাদারের মৃত্যুর পর আমি বেশ ভেঙে পড়ি । সবার আগে আমিই ওদেরকে খুব বড় একটা শ্বেতশুভ্র ফুলের ঝাড় দিয়ে আসি । সাদা ফুলের স্তবক বলা চলে । আসলে ব্রাদার যেন সত্যি আমার বড়ভাই ছিলো । যখন বিদেশে প্রথম আসি তখন ব্রাদার ও মমি আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন ও সঙ্গ দেন । গাড়ি চালাতে শিখেছি আমি ব্রাদারের কাছে । ড্রাইভিং স্কুলে নয় । ব্রাদার বলতো : আমি তোকে শিখিয়ে দেবো । খামোখা পয়সা খরচ করবি কেন ? টাকা পয়সাগুলো রেখে দে । অসময়ে কেউ দেখেনা রে ! তখন ঐ টাকাগুলিই বন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ।

একবার আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই । ব্রাদার আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় , পরে দুই বৌদি এসে সেবা যত্ন করে আমাকে সারিয়ে তোলে ।

তিননম্বর বৌদি পালোমা , তখন সন্তানসম্ভবা, ডেট কাছেই- তাই আসতে পারেনি । কিন্তু *এস এম এস* করে সবসময় আমার খবর নিতো । যেন আমি অসুস্থ আর ও খুব সুস্থ ।

সবাই বলছে, ব্রাদার ক্রিমিন্যালের রাইটহ্যান্ড ছিলো । এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক মাফিয়ার সাঁকরেদ । বিশ্বাস হয়না । আমাদের এই বাড়িটি ১৫ বছরের পুরনো । আমি নিজের পয়সায় কিনেছিলাম । পরে মজিদের সাথে ভাব ভালোবাসা হওয়ায় ও এসে আমার সঙ্গে

এখানে বসবাস করতে শুরু করে । ও একজন প্রফেশন্যাল ফুটবলার । আর আমি ইকোনমিক্স নিয়ে এখানে ডিগ্রী করার পরে রিটেল বায়ারের কাজ করি । আমাদের কাজ কোম্পানির জন্য, বিক্রেতা মানে সেলারের কাছ থেকে জিনিস কেনা যা আমরা পুনরায় বিক্রি করবো । এছাড়া আমার একটি বিকিকিনির অনলাইন বিজনেস আছে । সেখানে আমি একটি বুটিকের মতন চালাই কাজেই টাকাপয়সা আমার খুব একটা কম নেই । ঐ বাড়িও কিনেছি । লোন অনেকটা শোধ করে ফেলেছি ।

--এখন মজিদের সন্তান তোর কোল আলো করে এলেই আমরা সবাই খুশি । বলেন মমি ওড়নিভা ।এখানে তো স্বামীর সাথেই সন্তান হবে এরকম নিয়ম নেই কাজেই মমি হেসে হেসে এগুলি বলতেন আর ব্রাদার টিপ্পুনি কাটতো ।

খুবই মাখামাখি ছিলো আমার সঙ্গে । একবার আমি পিলুঘসেটি দেশে যাবার প্ল্যান করেছিলাম । ব্যাগড়া দেয় মজিদ । ততদিনে ও আমার বয়ফ্রেন্ড । তার আগে অল্পস্বল্প ফ্লার্ট যে করিনি তা নয় তবে আমি তো সুন্দরী , চটকদার । আমার পেছনে লোক তো লাগবেই । আমার এতে টাইমপাস হয়ে যেতো । তবে কারো সাথে আমি ফিজিক্যাল হইনি । চুমাচাটিও নয় । হাত ধরা ? তাও নয় । শুধু মিছিমিছি প্রেমগ্রন্থ নিয়ে নড়াচড়া , একটু আবদার , গুরুত্ব পাওয়া । এই পর্যন্তই ।

অচেনা দেশ , একাকীত্বে ভুগতাম ।

মজিদ সব জানে । এখানে কেউ কিছু মনে করেনা এসবে । কেউ সতীলক্ষ্মী নয়, কেউ সেরকম আশাও করেনা । আর মজিদের নিজেরই তো একটি ছেলে আছে ,অন্য নারীর সাথে । অনেক গার্লফ্রেন্ড ছিলো । সুপুরুষ খেলোয়াড় বলে কথা ! ও বলে : আমার একটিই বাচ্চা বলে মনে করতে পারি । অন্য মেয়েরা, সন্তানের পিতৃত্ব আমার ঘাড়ে কখনো চাপায়নি । এরও যে আমি ডিএনএ টেস্ট করেছি তা নয় । তবে মালিয়া আমার স্টেডি

গার্লফ্রেন্ড বহুদিনের । ওকে আমি বিশ্বাস করি । ও পয়সার জন্যে যেকোনো কাজ করবে না । আর আমি আমার সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব না নিলেও ও আমাকে কোর্টে নিতো না ।

মজিদের গার্লফ্রেন্ড ছিলো বেশ কয়েকটি, আমি জানি । আগে আমারই সাথে কত রূপসীকে নিয়ে আলোচনা করতো । কাকে বিছানায় কেমন লাগবে, কে সেক্স করার সময় মুখটা হেডমিস্ট্রেসের মতন গোমড়া করে রাখতে পারে, কে কামড়ে দেবে- এইসব । পরে আমাকে প্রপোজ করে বসে, তারপর যথারীতি বিয়ে । আমি জানতে চাই : আমি মনে নাহলেও শরীরে ভার্জিন বলে আমাকে বিয়ে করলে ?

ও হেসে বলে : আরে না না , তোমার মতন এরকম সাচ্চা একজন মানুষ কোথায় পাবো ? তবে কি জানো ডল (ও আমাকে পুতুল বলে না বলে ডল) অনেস্টিটা তোমার ইন্‌স্যানিটির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এটাই যা ভাবার বিষয় । এই জগতে থাকতে গেলে এত অনেস্ট হবার দরকার নেই । ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কাজ করবে । ভালোমন্দ মিলিয়েই মানুষ ।

এমন কোনো মানুষ আছে যে বলতে পারে কোনোদিন কোনো অন্যায় করেনি ? অশুদ্ধ চিন্তাও কিন্তু অন্যায় । আর বৃহত্তর স্বার্থে যে অন্যায় মানুষ করে তাকেও অন্যায় বলেনা ।

এই সুক্ষ্ম সীমারেখাটা মনে রাখলেই হল ।

ব্রাদারের মৃত্যুর কোনো কূল কিনারা হয়নি । এখন আমার ভরা মাস । যেকোনো সময়, সন্তান আমার কোল আলো করে আসবে । হঠাৎ-ই হয়ে গেলো ; কোনো পূর্ব প্ল্যান ছাড়াই । মমি শুনে বলেছেন : এরকমই ভালো । যে আসছে নিজের ভাগ্যে খাবে । আমি তো প্ল্যান করে মিহিং এর জন্ম দিলাম , কি হল ?

চোখ থেকে জল পড়েছে তখন ,শোকার্ত মায়ের । আমি আর কথা বাড়াই নি । ঘাউড়ি ধর্মে, সন্তান নিহত হলে বাবা ও মা তার পারলৌকিক কাজ করেন না । করেন বাইরের কেউ । এটাই নিয়ম

। সে অন্যজাতের মানুষও হতে পারেন তবে মৃতের সাথে তার আত্মিক যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন । হয়ত এইভাবে, সমস্ত মানুষের মধ্যে যে একই মহাজাগতিক চেতনা ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে , তাকে মনে করানো হয় । মমি ওড়নিভা আমাকেই বেছেছিলেন । বলেন : তোর ব্রাদার কাজেই তুই কাজ কর । মিহিং, তোর হাত থেকে শুভেচ্ছা বার্তা ও ফুলমালা পেলে পরম শান্তি পাবে । ও তোকে নিজের বোনের থেকেও বুঝি বেশি স্নেহ করতো ।

আমার তো কিন্তু কিন্তু করছিলো মন, শোনার পর থেকেই যে কেউ ব্রাদারকে গুলি করেছে আর আন্ডার ওয়ার্ল্ড কানেকশান থাকতে পারে । অনেস্টিটা আমার সত্যি একপ্রকার উন্মাদনার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে । স্তবকটি তো দিয়ে এসেছি ওদের বাসায় তারপরে কতবার যে মনে হয়েছে : শেষকালে একটা ক্রিমিন্যালের জন্য স্তবক দিয়ে এলাম ? একটা ক্রিমিন্যালকে ভাই বলতাম ?

একবারও মনে হয়নি যে এই ক্রিমিন্যালই একবার আমাকে একা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো , মরণের মুখ থেকে । অথবা এই মানুষটি আমায় কতনা সৎ পারমর্শ দিতো প্রতিনিয়ত ।

মানুষের মনটাই বুঝি এরকম । কখন কোনদিকে ঢলে পড়ে কে জানে !

এদিকে খেলোয়াড় মজিদ আমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছে । আজ তিন চারদিন বাড়ি আসেনি । হয়ত প্রথম সন্তান হবার উন্মাদনা তার নেই , কারণ আরেকটি সন্তান তো আছে । তাই মমি ও ব্রাদারের আরেক ভাই লেকান আমার দেখাশোনা করছে ।

একদিন হঠাৎ-ই বাড়িতে পুলিশ এলো, মজিদের সন্ধানে ।

আমরা কেউ তো জানিনা ও কোথায় । মমিকে পুলিশ বললো যে মিহিং এর হত্যার সাথে মজিদ জড়িত । আমরা দুজনেই অবাক

হতে পুলিশ অফিসার হ্যান্সি বলেন যে আসলে মজিদকেই মারতে এসেছিলো সেদিন । ভুল বশতঃ ব্রাদারকে মেরে গেছে । ব্রাদার কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত নয় । তবে জুয়া খেলা ও ঘোড়দৌড়ের অভ্যাস ছিলো । এক স্ত্রীর নামে একটি ব্যবসা চালাতো । সেটা বেআইনি অবশ্য নয় । কিন্তু তাতে অনেক পতিত, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ আসে । ওটা একটি লোকপ্রিয় নাইটক্লাব , আউল নাম । সেখানে ব্রাদার মেয়েদের রক্ষা করতো । ওরাও তাকে একজন প্রকৃত রক্ষক হিসেবেই দেখতো । কয়েক পেগ চড়ার পরেই, মেয়েদের বিছানায় নিয়ে যেতে চাইতো না ব্রাদার । কোনো মেয়েকে অহেতুক ম্যালাইন করতো না । তাই ওর মৃত্যুতে তারা শোকাহত । আর এদিকে মজিদ, খেলোয়াড় হওয়াতে ম্যাচ ফিক্সিং ও প্লেয়ারদের স্টেরয়েড অর্থাৎ নিষিদ্ধ সব ওষুধ সাপ্লাই করাতে যুক্ত ছিলো । সেই কারণেই অন্য কোনো দুনম্বরী লোকের চক্ষুশূল হয় ও তারা গুন্ডা দিয়ে মারাতে উদ্যত হয় । মাঝখান থেকে মারা যায় ব্রাদার । মজিদ একটি বড় গ্যাং এর সাথে যুক্ত ছিলো ।ওদের দলের পান্ডার নাম বিলি ব্রাউন আর রাসেল স্টর্ক । ওরা আগে বাইক নিয়ে নিয়ে গুন্ডামি করতো । পরে এসব ব্যবসায় নামে ।

পুলিশের কোনো কথাই আর আমার কর্ণকুহুরে প্রবেশ করছে না ।

এক অসহনীয় জ্বালা সর্ব শরীরে । এই জ্বালা কোনো স্বামী হারানোর কষ্ট নয় । এক ক্রিমিন্যালের সন্তানকে গর্ভে ধরে রাখার জ্বালা ।

মমি আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলে ওঠেন দৃঢ়স্বরে : ও শুধু মজিদের সন্তান নয় ও তোরও সন্তান । ওদিকটা যেমন ঘন কালো তোর দিকটা দুধের মতন সাদা । কাজেই আস্থা হারাস না । আমার ভাবি নাতি বা নাতনির জন্যে মঙ্গলদীপ জ্বেলে যাই -আজই আমার গডের কাছে একটি স্তবক উৎসর্গ করবো, তোর সন্তানের আনন্দময় জীবনপথের কামনা করে । আঁধারের পরেই আসে

আলো । নিকষ কালোরাত্রির পরেই দেখা যায় ভোরের প্রথম আলো । সোনামাখা রোদ ।

ও যদি অন্ধকারের যাত্রীও হয় , তুই ওকে আলোর দৃষ্টি দিবি । মনে করবি ও এক পথভ্রষ্ট যাত্রী । ওর হাত ধরে, অমৃতের পথে নিয়ে যাওয়াই তোর কর্তব্য । এটাই তোর এই জন্মের চ্যালেঞ্জ ।

মজিদ আর ফেরেনি । এই পরবাসে, মমি ও ব্রাদারের পরিবারই এখন আমার ও আমার ছেলে স্বর্ণেন্দুর সব । ওর নাম আমি হিন্দু মতেই দিয়েছি । ওর বাবার ছায়া থেকে দূরে রাখতে । মমি বলেন : ওর নামটা বড্ড খটমট । আমার উচ্চারণ করতে অসুবিধে হয় । আমি ওকে মোজি বলে ডাকবো । আমাদের ভাষায় দেবদূত ।

লেপাক্ষি

লেপাক্ষি এখন বিদেশে থাকে । ভারি সুন্দর একটি মেয়ে । শুধু রূপ নয় গুণেও । সে প্লেন সারায় । বিমানের কারিগর । প্লেনের মেকানিক , সহজ ভাষায় । প্লেনের মতন হাই টেক যন্ত্রের মিস্ত্রি হওয়া সহজ কথা নয় তাও একজন ভারতীয় মেয়ের পক্ষে । এই কাজ রিক্সা সারানোর মতন তো মোটেই নয় । আর লেপাক্ষির জীবনটা একটা বিপ্লব ।

ওর গল্পই এবার শোনা যাক ।

পশ্চিম ভারতের, নতুন রাজ্য নয়নহিতি। এখানে মুকুটহীন, প্রাচীন রাজবংশের প্রজাবৎসল রাজাই সব । যদিও ভোটে জেতা সরকারি শাসক আছে তবুও রাজাকেই লোকে গুরুত্ব দেয় বেশি ।

এখানে আর্শি নামক , একটি বহু পুরাতণ বীর জাতি বিরাজমান ।

তাদের সেনাপতি ও সেনাধ্যক্ষ ইত্যাদি সমস্ত ছিলো অন্য একটি উপজাতি ফাগুয়ার মানুষ । বংশ পরম্পরায় ফাগুয়াগণ, রাজপরিবার ও দেশের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করে এসেছে তাকে স্বীকৃতি দিতে আজও আর্শি রাজপরিবার, তাদের রাজার অভিষেকের সময় একজন ফাগুয়ার ডানহাতের বুড়ো আঙুল কেটে, রক্ত দিয়ে রাজটিকা পরিয়ে থাকে । তবেই অভিষেক সম্পূর্ণ হয় । এখানকার মেয়েরা জাত দেখে বিয়ে করেনা । রাজার মেয়ে ফাগুয়ার ঘরের বৌ হতে পারে, আবার ফাগুয়ার ঘরের মেয়ে কিংবা ছেলে রাজার ঘরে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম -বিবাহসূত্রে ।

একধরণের কমিউনিজম । এবং বহু আগে থেকে প্রচলিত ।

ভারতে সৃষ্ট কোনো কিছুই আমাদের কাছে গুরুত্ব পায়না । সেই জিনিসই যখন ওয়েস্টের কোনো দেশ থেকে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে করে আসে , আমাদের চোখ খুলে যায় । মুড়ি, আমরা

অভিজাত মানুষেরা তেমন খাইনা, বড্ড গেঁয়ো খাবার- কিন্তু গোগ্রাসে খাই পাফড্ রাইস ।

কাজেই নয়নহিতি নগরের মানুষ ও তাদের নানান চমকপ্রদ কার্যকলাপ ও রীতির কথা সবাই জানে না, অনেক বেশি জানে বেইরুট , কিংশাসা অথবা জোহানেস্বার্গের কথা ।

এছাড়াও এই রাজ্যে, যেইসব পুরুষেরা তাদের রুক্ষ্ম, শুস্ক মাতৃভূমে সবুজের স্পর্শ দিতে সক্ষম ; নানানভাবে মাটিকে উর্বর করে- তাদেরও সমাজে খুব সম্মান । মাটি ওদের কাছে মা । আর মায়ের গর্ভসঞ্চারে এখানে সন্তানেরা সাহায্য করে ।দিগন্তছোঁয়া-সতেজ, হরিয়ালি ক্ষেতখামার , সর্ষেফুলের স্বর্ণাভ মায়া আর নানান মরসুমি ফসলের দোলায় দুলে ওঠে কোনো কোনো রূপবতীর মন । তাকেই বরমাল্য দান করে মেয়েরা ।সে একজন আর্শি হোক অথবা ফাগুয়া । এখানে আরো দুটি প্রাচীন প্রথা চলে । এক হল, মেয়েদের স্বয়ম্বর সভা ডাকতে পারে তাদের পরিবার । উপযুক্ত পুরুষেরা উপস্থিত থেকে, কন্যাকে বধূ রূপে পেতে পারে । স্বয়ম্বর সভা নাও ডাকতে পারে মেয়ের পরিবার । যদি কন্যা আগেই কাউকে বর হিসেবে বেছে থাকে ।

এছাড়া এখানে হারেমের কনসেপ্ট আছে । রাজার হারেম আছে । সেখানে অনেক রূপসী থাকে । সবাই রাজার স্ত্রী । রাজার নিজধর্ম আছে । ওদের আইন অনুসারে, রাজা বহুবিবাহ করতে সক্ষম । কারণ যত স্ত্রী থাকবে তত সন্তান । তাতে রাজবংশের লোকবল বাড়বে তাছাড়া বিভিন্ন বংশের রক্ত এলে, অনেক উন্নত হবে পরের প্রজন্ম ও কূটনৈতিক সম্পর্কও ভালো হবে অন্যান্য রাজাদের সাথে । তাই এখনও রাজা অনেক পত্নী রাখতে পারেন । কিন্তু আজকালকার যুগে দুই স্ত্রীর বেশি রাখা ও পালন পোষণ করা একটু অবাস্তবিক । তাই বর্তমান রাজার পাটরাণী একজন । অন্যজন মিনি পাটরাণী । বা কনসর্ট ।

দুজনেই সব সুবিধে পান । অন্যান্যরা হারেমে থাকেন । তারাও প্রচুর সুবিধে ভোগ করেন শুধু রাজার খাস সঙ্গী হতে পারেন না

কিংবা রাজার সাথে দৈহিক সংযোগ হয়ত কালেভদ্রে হয় । যদি রাজার মনের কোণে তাদের কারো কথা ফুটে ওঠে ।

অনেকে ফাগুয়া সাথীর সাথে মন দেওয়া নেওয়া করে ফেলেন ।

অন্যরা পুজোপাঠ নিয়ে জীবন কাটান । কেউ কেউ নানা রেসে যোগ দেন । ঘোড়ার রেস অথবা কার রেস । কেউ কেউ বিজনেস করেন বেনামে । দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসাটি হয় কসমেটিক্স এর বা হাল ফ্যাশানের সব পোষাকের অথবা গয়নার । পাথরের গয়না । যা এইদেশে সহজলভ্য । পাথর আর বালিয়াড়ি ও অসময়ের বৃষ্টি এই নিয়েই নয়নহিতি ।

এছাড়া , নয়নহিতি রাজ্য সাপের আখড়া । এখানে বিষাক্ত সব সাপ দেখা যায় । তারা কিন্তু লোকাল মানুষকে কামড়ায় না । পাহাড়ি সাপ । বালিয়াড়ি ভেদ করে প্রায়ই ঢুকে পড়ে কারো না কারো ঘরে । কিন্তু ছোবলে কেউ মরে না । অনেক সময় গৃহপালিত কুকুরের মতন বাড়ির শিশুদের ঘিরে থাকে নানান সাপ । ওদের রক্ষক হিসেবে । শীতের রোদে হয়ত কোনো শিশু শুয়ে । সদ্য একবছর বয়স হয়েছে তার । শীতঘুম থেকে উঠে এসে সাপ তাকে পাহাড়া দিচ্ছে , এরকম দৃশ্যও দেখা যায় ।

ফাগুয়া জাতি সাপ খায় । সাপের রক্ত , চামড়া ভাজা , মাংস , ছোট ছোট হাড়গুলি বেটে খায় ।কিছুই প্রায় ফেলেনা । ওদের ডেলিকেসি ।

যুদ্ধ ছাড়াও ফাগুয়ারা আগে সাপের খেলা দেখাতো । এখনও অনেকেই ঐ পেশায় যুক্ত । সারাবছর তো অনেক সাপ মারে তাই ওদের -নাগমণি উৎসবে ওরা এলাকার সাপ ধরে আনে । তাদের টানা সাতদিন বাড়িতে পুষে রেখে খেতে দেয় । তারপর তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসে লোকালয়ের বাইরে । এতে নাকি সারাবছরের সাপ মারার পাপ কমে যায়, শাপমোচন বলা যায় । কেউ যদি সাপ ধরতে গিয়ে কোবরার সন্ধান পায় তাহলে নাকি খুব ভালো । তার অনেকটা পাপ, ওর পাপের ঘড়া খালি করে বেরিয়ে গেছে । এখানে

নাকি সর্পকন্যারা ঘাপটি মেরে আছে । মানুষের অর্থাৎ ফাগুয়া উপজাতির সব কান্ডকারখানা পর্যবেক্ষণ করছে । তাই ভালোমানুষের পো-এরা , পরের বছর একটা দুটো কোবরা পেয়েও যেতে পারে । সবাই তাই ভালো হতে চায়, সাপ খেতে খেতেও ।

আমাদের নায়িকা লেপাক্ষি নাকি সর্পকন্যা । কারণ তার যৌবন প্রস্ফুটিত হলেও বিয়ে করা অথবা মন দেওয়া নেওয়ার দিকে তার কোনো আকর্ষণ নেই । বিয়ের বয়স এখানে ১৮ । কিন্তু সে বিয়ে করবে না । নিজ সিদ্ধান্তে অটল । পরিবার চাপ দিতে থাকে । শেষে অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে, অসম্ভব পৃথুলা হয়ে যাওয়ায় বিশেষ সুবিধে হয়না বিয়ের বাজারে । তখন মানুষ ভাবে যে ও আসলে সর্পকন্যা । লুকিয়ে আছে এখানে -মানুষ সেজে ।

লেপাক্ষি, আর্শিজাতির মেয়ে নয় । ও ফাগুয়া উপজাতির মেয়ে । ওর বাবা ওখানে রেলে কাজ করতেন । এরপরে, লেপাক্ষিকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে হারেমে রেখে দেয় । হারেমকে এখানে বলে তিন্দা । তিন্দায় ওকে রাখা হয়, হারেমের রূপসীদের সুরক্ষার জন্য । ও তো অতিমানবী, কাজেই ও একা থাকা মানেই দশজন পুরুষরক্ষীর সমান । নয়নহিতির মানুষ মনে করে যে ওর তৃতীয় নয়ন কাজ করে । কাজেই ও যা দেখতে পায় , বুঝতে পারে তা অন্য কেউ পারেনা ।

হারেমে থাকতে শুরু করে লেপাক্ষি । দেখে রূপসীরা কত দু:খী । রাজার বৌ-ই তো সবাই কিন্তু রাজার মন পায়না। কখনো কখনো হয়ত বা রাজা আসেন । কিছুদিন থাকেন কয়েকজনের সাথে আবার চলে যান । এদের রূপ আছে , অর্থ আছে কিন্তু মনে সুখ নেই । আনন্দ নেই । লেপাক্ষি, ওদের মানসিকভাবে সঙ্গদান করতে শুরু করে । কারণ ওর নিজের কোনো দৈহিক চাহিদা নেই । ও সাধ্বী কিংবা সন্ন্যাসিনী নয় আবার শারীরিকভাবে অক্ষমও নয় । তাহলে ?

বিদেশে , এইধরণের মানুষদের বলে : Asexual .

এইরকম মানুষও যে দুনিয়ায় আছে তা বিদেশীরা স্বীকার করেছে। সেক্সের বাইরেও অস্তিত্ব হয় । সবার কাছে, জীবনের গানের স্বরলিপি অন্ডকোষ দিয়ে শুরু হয়ে ক্লেদাক্ত যোনিপথে ফুরায় না। শুধু মনে মনেও ফুটে ওঠে অবিনশ্বর প্রেম যা চিরবসন্তের পরশে থাকে অটুট, ঝরাফুল হয় না কখনই। বিষ্ণু ও শিবের পুত্রের নাম হরিহরপুত্রণ। বিষ্ণুর মোহিনী রূপে মোহিত হয়ে শিব, তার সাথে সন্তান উৎপাদন করেন।

এখানে কোনো দৈহিক সম্পর্ক যুক্ত নয় । একে বলে মাইন্ড প্রজেকশান । সাটেল ভাইব্রেশানের খেলা আরকি । সেরকম লেপাক্ষিও বুঝি কোনো সেলেসিয়াল বিং। যার মনের পরশে, বহু নারীর অতৃপ্ত কামাগ্নি দপ্ করে নিভে যায়। শান্তির বীজ বোনা হয় চেতনায়। স্বামীসুখে বঞ্চিত রমণীরা , নিজেদের ভাঙা কুলো মনে করে না আর। তারা সবাই আজ ভীষণ সমৃদ্ধ ,পূর্ণকুম্ভের মতন তাদের অবয়ব, মরাল গ্রীবা কেবলই অমৃতবর্ষিণী , মনে সবসময়ই হেমবেহাগ ও মধুবন্তীর হিল্লোল।

বিদেশে এখন এদের ক্লাব ও সংগঠন তৈরি হয়েছে। কিন্তু লেপাক্ষি ছিলো ভারতে, কাজেই ওকে মানুষ সর্পকন্যা আখ্যা দিয়েছে। নাহলে সুস্থ, স্বাভাবিক নারীর, দেহের চাহিদা নেই এটা কেমন অদ্ভুত নয় কি ? হ্যাঁ, সে হয়ত সবার সামনে প্রকাশ করেনা , লাজে -কিন্তু ইচ্ছে তো হয়ই।

লেপাক্ষির মনের চাহিদা আছে। প্রেমের পরশ সেও চায়, অসম্ভব ক্ষুধা তার- তবে মনে মনে। দৈহিক চাহিদা থেকে সে অনেক দূরে । এটা কোনো উন্মাদনা নয় ।এরা অন্যধরণের মানুষ, হয়ত কোনো নক্ষত্র-মহিষী অথবা জোছনা-স্ফুলিঙ্গ। তাই বুঝি ওকে ফাগুয়ারা বলে - সর্পকন্যা। সাপ-ঠাকুরাণী।

কিন্তু লেপাক্ষির মতন স্বাধীনচেতা মেয়ে, হারেমে বন্দিনী হবার জন্য জন্মায়নি । সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় । ওদের বংশের পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র যা ওর পূর্বপুরুষেরা ব্যবহার করে এসেছেন, সেগুলি নিয়ে নড়াচড়া করে । পরিত্যক্ত কামান যা কেল্লার পেছনে রাখা সেটা নিয়ে গবেষণা করে ।

ওর একটি পাতানো প্রেমিকও আছে যার কথা আর কেউ জানেনা । তার নাম চেতন । চেট বলে ডাকে লেপাক্ষি । সে ব্যাঙ্কে কাজ করে । কিন্তু খুব দু:খী কারণ লেপাক্ষির দেহের কোনো চাহিদা নেই তাই সে প্রথাগত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়না । বলে : সারাদিন আমি তোমার সাথে থাকবো । রাতে বাড়ি চলে যাবো । মনে মনে তো সবসময়ই আছি , তোমারই কাছে । হয়ত তোমার জন্যেই আমি পূর্ণতা পেয়েছি, নারী হিসেবে ।

হারেমে, সমস্ত রমণীরা লেপাক্ষিকে ভালোবাসে । ও তাদের মেঘমন্দ্রিত জীবনে -মনের অর্থাৎ সোনারোদের পরশ দেয় , অসময়ের বৃষ্টির মতন । অগ্নিবাণে, তেতে ওঠা- তপ্তবালিতে যা মধুবর্ষণ করে । বর্ষায়, প্রথম কদম ফুলের মতন প্রথম বৃষ্টি পড়লে এখানে-- পেহেলি বারিষ ভিগি ভিগি -উৎসব হয় । সবাই বৃষ্টিতে ভিজে নাচে । রেনড্যান্স । রাজা উজিরেরাও যোগদান করেন । তাদের প্রাইভেট কোর্ট ইয়ার্ডে কোমড় দুলিয়ে নাচেন কোনো বিশেষ মনমাতানো সুরের সঙ্গে । অনেক সময় নিজেদের মিউজিশিয়ান এই বিশেষ উৎসবের জন্য সুর রচনা করেন যা বাজিয়ে নৃত্যকর্ম সারা হয় ।

লেপাক্ষির, এই একটা হারেমের উৎসব খুব ভালো লেগেছিলো । সব হিংসা ভুলে, রূপসীরা এইসময় আনন্দ উৎসবে যোগ দেন । প্রাণসঞ্চার করা হয় এই অনুষ্ঠানে, নৃত্য-পটিয়সীদের রাঙিয়ে । রং , নাচ , বর্ষা আর নতুন দিনের আলো । লেপাক্ষির বড্ড দূর্বলতা আছে এই পেহেলি বারিষ ভিগি ভিগি উৎসব নিয়ে ।

হারেম থেকে মুক্তি পায় এক বিদেশী রূপবতী, মেহেরজানের সহায়তায় । মেহের ওকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে । মেহের আবার ফ্যাশানিস্টা ও হাল ফ্যাশানের জামা জুতো ব্যাগ বিক্রির ব্যবসা করে ।

লেপাক্ষি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো : এইসব ফ্যাশান শোতে যেসব জামা পরে মডেলরা ঘোরে, ওগুলো কারা কেনে ? কৈ হারেমে কিংবা ধনীর দুলালীদের তো ঐ পোষাকে ও দেখেনি ! মেহের হাসে --- বলে , সবকিছু ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি হয়না । বড়লোকেরা নিজেদের অর্থবল দেখানোর জন্যেও অনেক কিছু করে । একটা পোষাক যার দাম এক কোটি টাকা সেটা সাধারণ মানুষ কিনতে পারেনা । বিশেষ বিমান যা লন্ডন থেকে দিল্লী, মাত্র দু ঘন্টায় পৌঁছে দিতে পারে তার টিকিট অনেক দামী । সেটা কিনতে পারাই একটা স্টেটাস সিম্বল । তারপর কেউ ব্যবহার করছে কিনা , পোষাক পরছে কিনা তা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না । এগুলি অনেকটা মানুষের অবসেশান । দুনিয়ায় দুটো জিনিসই তো আছে , প্যাশান আর অবসেশান ।

দেখনা, আমার কি পয়সার অভাব আছে ? তবু আমি ব্যবসা করছি কেন ? আনন্দকণা তো আমি অন্যকিছু থেকেও সংগ্রহ করে নিতে পারি । আমি এটা করছি দেখানোর জন্য যে কত রূপবতীরা , সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা আমার সৃষ্ট জিনিস কেনে অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি হেলনে চলে । আমি কত পাওয়ারফুল ।

চেতন বা চেট বিদেশে আসে ভারত সরকারের দূত হিসেবে । ওদের পূর্বপুরুষেরা, নয়নহিতি রাজপরিবারের দূত হিসেবেই কাজ করতো । ডিপ্লোম্যাসি ওদের রক্তে । শুধু ফরেন সার্ভিসের পুঁথিপাঠ নয়, ওদের এইদিকে আলাদা ট্যালেন্ট আছে । ব্যাঙ্কের কাজটা আর করেনা ।

ওকে চেট নামেই সবাই ডাকে । পরে ও এইদেশে নিয়ে আসে মনের সাথী লেপাক্ষিকে, গার্লফ্রেন্ড হিসেবে । ওর প্ল্যাটোনিক

লাভের সাথী । সূর্য ওঠা ভোর আর কেবলই তারায় ভরা রাতি । ওকে কয়েকবার বলেছে : আমি যদি জোর করে তোমার সাথে দৈহিক সংযোগ করি ?

লেপাক্ষিকে, ও লোপা বলে ডাকে । লোপা বলেছে : তাতে আমার শরীরটাই পাবে আর পাবে মনবেদনা । আমাকে পাবে না । আমি যে তোমায় সম্মান দিই ,তুমি আমার নিজস্বতা বজায় রাখতে দিয়েছো আমাদের রিলেশানশিপে তারজন্য, সেটাও তখন তুমি হারাবে ।

চেট কিছু বলেনা । মনে মনে দু:খ পায় । কিন্তু লোপাকেই ও ভালোবাসে । আর কাউকে কল্পনা করতে পারেনা ওর জায়গায় । লোপার পরিচ্ছন্ন মন , স্বাধীন চিন্তাধারা , মানবিকতা ও কোমলতা ওকে স্পর্শ করে ।

সেক্স একটা টুল । আসল মনটা । এইসব ভেবে নিজেকে সংযত রাখে ।

লেপাক্ষি এখানে এসে চেটের সাথেই থাকে । বন্ধুরা বলে : এরকম এক ডানাকাটা পরীকে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসে খুব এনজয় করছো । এবার বিয়েটাও সেরে ফেলো । আমাদের এরকম একটা সুন্দরী সঙ্গিনী থাকলে অফিসেই আসতাম কিনা সন্দেহ । সারাটা দিন জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতাম । আর চুমু খেতাম , আর -----!

চেটের কল্যাণেই সে বিমান সারানোর কাজে কিছু সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা করেছে । ইঞ্জিনীয়ার হতে গেলে বিদেশে, আরো আগে আসতে হত । সেটা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাই মিনি ইঞ্জিনীয়ার হতে পেরেছে । ও তাতেই খুশি । ভালই কাজের হাত । টেকনোলজিতে ওর একটা ন্যাচেরাল ট্যালেন্ট আছে । সেটা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকটাই । চেট নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত । আর সর্পকন্যা বিমান সারানো নিয়ে ।

বলে : অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি । চেট না থাকলে আর ও এত উদার নাহলে আমি ঐ কুসংস্কারের কবলে পড়ে ,এতদিনে দমবন্ধ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করতাম । অনেকে ঐ হারেমে আমাকে পুজো দিতে আসতো । ফলফুল , মন্ডা মিঠাই দিয়ে আমাদের বাড়ির আঙিনা ভরিয়ে দিয়ে যেতো রোজ । আমি নাকি সর্পদেবী !

আমি একদিন বড় বড় করে লিখে রাখলাম, দেওয়ালে : তোমরা যাকে এগুলো দিচ্ছো সে এগুলো নিচ্ছে না ।

তাতেও কাজ হলনা । শেষে চেটের সঙ্গে বিদেশে পলায়ন । আমি আর দেশে যাইনি । বাবা , মা , ভাইবোনেদের হয়ত আর কোনোদিনই দেখতে পাবোনা । চেট তো যায় । ওকে কাজের জন্যে ভারতে যেতেই হয় । তবে ও নয়নহিতিতে আর যায়নি ।

রোজ রাতে লেপাক্ষি একটা খেলা খেলে । নিজেকে আর্শিতে দেখে । ওর অবয়বে ওর দোষগুলি ফুটে ওঠে । তাইনা দেখে ও ধীরে ধীরে নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে । আবার নিজেকে দেখে । বারবার নিজের প্রতিফলন দেখে । নিজেকে শোধরবার চেষ্টা করে । প্রত্যেকে সৎ ও শুদ্ধ হলেই- সমাজও সুন্দর হয় । আর তা করতে পারে একমাত্র মানুষ নিজেই । এটাই ওর বিশ্বাস । আর মানুষ বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে বাঁচে । জীবন পদ্মপত্রের নীড় । মানুষ শেষ হয়ে যায় কিন্তু থেকে যায় কর্ম ।

কাজেই ভাবিয়া করিও কাজ , করিয়া ভাবিও না ।

সে হও তুমি মানুষ অথবা এক সর্পকন্যা ।

ঘন ও হালকা পাহাড়ি অরণ্যপথে- চারবন্ধু কুহক , মঘা, রোশনি ও ছন্দস্ বড় একটা এস ইউ ভি -চেপে যাচ্ছিলো । হঠাৎ দেখতে পেলো একটা বোর্ড-এখানে গরম চা ও গরমাগরম চিপস্ পাওয়া যায় । অর্ডার দিলে মাংস , ডিম , ভাত ও আলুর দম রান্না করে দেওয়া হয় ।

বোর্ডটা ইংলিশে লেখা । নিচে বাংলা তর্জমা রয়েছে ।

এই দূরদেশে, তাও বনপথে-বাংলায় বোর্ড লেখা দেখে কিছুটা কৌতুহলেই ঢুকে পড়ে চারবন্ধু । চা ও টা মিলবে প্লাস খানা-খাজানার ব্যাপারটা জানা যাবে । ওরা একটি ড্যাম দেখতে যাচ্ছে । ড্যামটির কাছেই পুজিত হন দেবী বনদুর্গা । এখান থেকে একঘন্টার পথ । ড্যামের অপরূপ শোভা দেখে, তার পাশেই একটি ছায়াঘন, গুলমোহর রঞ্জিত, স্বপ্নঝরা পথে কিছুটা ট্রেক করে আবার এইপথেই ফিরবে । এদিকে খাবার দোকান নেই আগেই শুনেছিলো । তাই সঙ্গে ফলমূল, কেক ও বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলো । কিন্তু এই বোর্ডটি চোখে পড়াতে যেন হাতে স্বর্গ পেলো । ওদের আবার অনেক ক্ষ্যাপামি আছে । একবার ওরা গোপালপুর অন সি দেখতে যায় সদলবলে । আরো অনেকে ছিলো সেবার সঙ্গে । তখন একটি পথপাশের হোটেলে খেয়ে, ছন্দসের ফুড-পয়জন হয়ে যায় । শেষে গাড়ি থামিয়ে ওকে রাস্তায় নামতে হয় , একটি গ্রামে ঢোকার আগে নির্জন পথে , ঝোপের আড়ালে বসে । জলের অভাবে ব্যবহার করতে হয় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পেপসির বোতল । তরল পেপসি দিয়ে পরিস্কার করা হয় দেহের আবর্জনা , যাকে বলা হয় Feces.

আজ এখানে, ভেতরে গিয়ে দেখা গেলো যে এটা আদতে একটি কাঠ চেরাই করার দোকান । অর্থাৎ সোজা ভাষায় কাঠগোলা । বেশ

কিছু কর্মী ও একটা বাচ্চা চাকরকে দেখা গেলো । বাচ্চা মানে শিশু শ্রমিক নয় প্রায় যুবক আর কি । মালিক একজন ভদ্রমহিলা । কাঠ চেরাই করে জীবিকা নির্বাহ করেন । নাম সুলেখা মান্না । অবিবাহিতা । ম্যান ফ্রাইডের নাম ভীম ।

চারবন্ধু, চায়ের ফরমাইশ করে চিপসের প্লেট হাতে নিয়ে গল্প জুড়ে দিলো । তার আগে সুলেখা জানালো যে মাছ ব্যাতীত অন্য নন- ভেজ রান্না করে দেবে । যদি পথিকের সাথে থাকে । মাছ - কাটা , বাছা ও ধোয়ার লোক নেই । যদি সঙ্গে না থাকে তখন টাকা দিয়ে দিলে ওরা মাংস (খাসি ও মূর্গী) অথবা মূর্গী বা হাঁসের ডিমের ঝোল বানিয়ে দেবে । ছন্দস্, মঘা , কুহক ও রোশনি নিজেরা কথা বলে স্থির করলো যে মাংসই খাবে । সেইমতন টাকা দিয়ে কচি পাঁঠার মাংস ও ডাল ভাত ওমলেট খাবে বলে রওনা দিলে ড্যামের দিকে ।

ফিরে আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেলো ।

দোকানে ঢুকে , খেয়ে , বিশ্রাম করতে করতে রাত হয়ে গেলো । সুলেখা বললো : এত রাতে বনের পথে যাবেন ? অচেনা জায়গা ! আজকে রাতটা আমাদের বাংলোতে চলুন । আমি , ভীম আর আমাদের কুকুর বনিথন থাকে । এক বুড়ি আছে । ভীমের মা । জবলা মাসি । সেই রান্না করে দেয় ।

ওরা ভাবলো : বেড়াতেই তো বেড়িয়েছে । কেউ বাড়িতে ওদের জন্যে বসেও নেই । তাহলে এই বাংলোতে আজ রাতটা থেকে গেলে একটা অন্য অভিজ্ঞতা হবে । সুলেখার সাথে বেশ জমে উঠেছে । ও কিন্তু শুধু মাংসের দামটা নিয়েছে । বাঙালী বলে অন্য সবকিছু ফ্রিতে দিয়ে দিয়েছে । ভীম খুব গাট্টাগোট্টা -- হো দিদি , বলে সুলেখাকে সম্বোধন করছে । ভীমনাদ যেন । কাঠ চেরাই এর লোকগুলো বিকেল নাগাদ বাড়ি চলে গেছে । ওরা পাহাড়ি পথে হেঁটে আসে ও যায় । পাদদেশে ওদের বস্তি । লোকাল আদিবাসী । গান গাইতে গাইতে আসে ও কাজ শেষে গান করতে করতে ফিরে

যায় । তাতে মনটা তাজা থাকে । সব গান থেকে অর্থ আসেনা । সব গান রেকর্ডে গিয়ে মেশে না । কিছু কিছু গান মানুষ নিজের জন্যেও গায় । আআর ওযুধ সেই গান ।

সুলেখার বাংলো খুব একটা দূরে নয় । উল্টো দিকের রাস্তায় । বাগান ঘেরা বাড়ি । একজন বুড়ি মনে হয় কানে কম শোনে সেই জবলা মাসি । বিশাল আকৃতির সারমেয় । বনিথন নাম তার । সবাইকে দেখলো , সবার সাথেই আলাপ হল । কুকুরটি খুব মিশুকে ।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট সেইভাবে নেই কারণ বিকেল নাগাদ খেয়েছে মাংস ভাত ।

তাই রাতে কফি ও কিছু স্ন্যাকস্ খেলো । জবলা মাসির বানানো পাকোড়া ও বেগুনি । অল্প মিষ্টি । নারকেলের বড় বড় নাড়ু । ওদের ঘর দেখিয়ে দিলো ভীম ।

সুলেখা বাগানে চেয়ার পেতে বসলো । ওরা তাকে ঘিরে বসলো সবাই । আজ একটু বেশি গরম । বাইরে শীতল বাতাস ।

ঠিক করলো একটু গল্প করে শুতে যাবে ।

সুলেখার জীবন বড় বিচিত্র । মেয়ে হয়ে, তাও বাঙালী -কেন কাঠ চেরাই এর ব্যবসা করছে এই দূরদেশে ওরা জানতে চাইলো ।

সে বললো : আমার বাবা বাংলার বাইরের রানার, রানার চলেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে , রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে- মৃদু বেসুরে গেয়ে উঠলো । বাবা পোস্টম্যানের কাজ করতেন । দুই বোন আমরা । কোনদিন চাননি মেয়ে বলে আমরা কোনো কিছুতে পিছিয়ে থাকি । বাবা একটা ছেলে চেয়েছিলেন । হয়নি । ভেঙে পড়েননি ।

দুই মেয়েকে ছেলের মতন মানুষ করেছেন । দিদি ডাক্তারি পড়েছে । স্পেশালিস্ট হয়েছে । নিউরোসার্জেন । বিদেশে গিয়েছিলো । আর আমি পড়াশোনায় ফাঁকি দিতাম বলে কাঠের ব্যবসায় নেমেছি কারণ এই কাজে মেয়েরা কম আসে । আগে অন্যদিকের একটি ঘন অরণ্যে ছিলাম । সেখানেই ভীমের সাথে দেখা । সে ওখানে, কাছের শহরে ড্রেন পরিষ্কার করতো । নোংরা জলে নেমে, সভ্যতার আবর্জনা পরিষ্কার করা । বলতোঃ আমরাও এই হাত দিয়ে দুবেলা খাবার খাই । কেমন লাগে বলো দেখি দিদি রোজ ঐ নোংরাগুলো ঘাঁটার পরে ! আমরাও তো মানুষ রে বাবা । নাহয় গরীব মানুষ কিন্তু লজ্জা , ঘেন্না , শোকতাপ তো আমাদেরও আছে নাকি ?

খুব দু:খ হল শুনে। আমার বাবা পোস্টম্যান ছিলেন কাজেই দরিদ্রতার রূপ আমরাও দেখেছি তাই ভীমকে আমি নিয়ে এলাম । গাড়ি চালানো শিখে ও কাজ নিলো আমার কাছে । ওর মা জবলা মাসিও এখানেই রয়ে গেলো । নানান মানুষের করুণ কাহিনী ও মেয়েদের ওপরে বলশালী মানুষের অসংখ্য অত্যাচারের কথা শুনে শুনে আমি এক অদ্ভুত ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাই । কেন যেন মনে হতে থাকে : দূর্বল হওয়া চলবে না । জবলামাসির মতন পুরুষের মুখাপেক্ষী হলে পুরুষ অত্যাচার করতে শুরু করতে পারে । একটু শরীর স্বাস্থ্যে কোমলতার ছাপ ফুটে উঠলে অথবা দেহযন্ত্র বিকল হতে শুরু করলেই হায়নারা লুটে পুটে খাবে । ওরা ওঁৎ পেতেই আছে । কাজেই আমাকে আরো বলশালী হতে হবে, আমার শক্তি দীর্ঘদিনের জন্য ধরে রাখতে হবে ।

আমার দিদি তো চিকিৎসক , বিদেশে ছিলো । ও একবার আমাকে বলেছিলো যে চীনারা , ওদের ট্র্যাডিশন্যাল ওষুধে নানান জীবজন্তুর হাড় , রক্ত , গন্ডারের শিং ও অন্যান্য দেহাংশ ব্যবহার করে - দেহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য । আমি সেই বিষয়টা নিয়ে একটু গবেষণা করলাম । তারপর ভীমকে সাথে নিয়ে ও কিছু পোচারের সাথে জুটে গিয়ে, বাঘ ও অন্যান্য জন্তু যেমন হরিণ , ভাল্লুক মেরে --

খেতে শুরু করি ওদের নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । দেহকে দূর্বল হতে দিলে চলবে না ।

শরীরের নাম মহাশয় , যা সওয়াবে তাই সয় ।

এরকম ভাবেই চলতো যদি না দিদি একদিন আমার কাছে বেড়াতে আসতো । দিদি বিদেশে চলে যায় । কিন্তু ওখানে স্পেশালিস্টের কাজ করতে পারেনা । ওদের দেশের ডিগ্রি করতে হয় তার জন্যে । সেটা দিদির পক্ষে অসম্ভব ছিলো কারণ কাজ না করলে দিন চলবে না আর পড়া, অত কঠিন সাবজেক্ট, সার্জারির পাঠ নেওয়া ও কাজ করা দুটো একসাথে একটু মুসকিল । তাই দিদি ওখানে জেনেরাল ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করতো । ওর নিউরোসার্জারির ডিগ্রিটা বুঝি বিফলে গেলো । দেশে চিরটাকাল স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে । ভালো ফল করতো । সার্জারির হাতও খুব ভালো ছিলো । তাই জেনেরাল প্র্যাকটিশ করতে করতে বোর হয়ে যায় । ভালো ডাক্তার- কিন্তু জ্বর, পেটব্যাথা আর হাঁচি কাশির ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হয় বসে বসে ।

শেষে এক কু-মতলব এলো মাথায় । মানুষের দুই মন । ইনার ভয়েস বা সু-মন আর অন্যটা কু-মন । কু-মন এর পরামর্শে দিদি, বয়স্ক রুগীদের ঘুমের ওষুধ দিয়ে প্রায় অবশ করে- তাদের সম্পত্তির উইল বদলে দিতে বাধ্য করতো । অনেক টাকা হলে ও কাজ ছেড়ে স্পেশালাইজেশান ও সুপার-স্পেশালাইজেশান করতে পারবে। ডাক্তারি প্যাশান ছিলো দিদির ।

তার আগে খুব ভালো ব্যবহার করতো রুগীদের সাথে । এমনিতে ও খুব কোমল ও বিনয়ী । আর ভালো ডাক্তার তো বটেই । জনপ্রিয় ছিলই । বেশিরভাগই রোগিনী এবং বৃদ্ধা । অনেক রুগী পঙ্গু ও নি:সঙ্গ । কয়েকটি এরকম কেস হবার পরে দিদি একদিন দেখতে পেলো ওর ভবিষ্যৎ । মানুষ পাস্ট লাইফ দেখে -ও দেখলো ফিউচার ।

পরের জন্মে ও এক অন্ধ মেয়ে হবে । কিশোরী থাকার সময় মাতৃহীনা হবে । বাবা সাধারণ কর্মী । ওয়ার্কিং ক্লাসের মানুষ ।

তার আবার সাধু সঙ্গ করার নেশা ছিলো । এরকমভাবে এক সাধুর খপ্পরে পড়বে দিদি যে ওকে মলেস্ট করবে । মেয়েটির খুব মনবেদনা হবে।। এতটাই যে সে উন্মাদ হয়ে যাবে । তার আয়ু ছিলো দীর্ঘ । দীর্ঘায়ু । বাঁচবে ৯৯ বছর । সেইসব বছর, অন্ধ মেয়েটি পাগলাগারদে কাটাবে । এই ঘটনা দিদি তার তৃতীয় নয়ন বা থার্ড আইতে দেখে যাকে বিজ্ঞানীরা বলে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড । বেশ কয়েকবার ।

তুমি যদি কারো জীবনে অকারণে রেস্ট্রিকশান নিয়ে আসো , কাউকে ভাঁওতাবাজি দিয়ে ক্রমাগত ঠকাও, সেই একই ঘটনার সম্মুখীন, তোমাকেও একদিন হতে হবে । ইউনিভার্সকে, যা দেবে তাই তোমার কাছে ফিরে আসবে । এটা একটা বৃত্তের মতন । এবং তা এক জন্মে সীমাবদ্ধ নয় । আমাদের প্রতিটি কাজের ও চিন্তার ব্লু প্রিন্ট থেকে যায় মহাবিশ্বে । আকাশের কড়িকাঠে । মিডিয়ামরা একে বলেন : আকাশিক রেকর্ড । (Akashic records).

এগুলি দেখে ভীত ,লজ্জিত দিদি । তাই কেউ ওকে সন্দেহ করার আগেই ও ক্লিনিকের কাজ ছেড়ে দেয় ।এখন ও দেশে চলে এসেছে । কফিনের ব্যবসা করে । এখানে নিউরোসার্জেনের কাজ নিয়েছে । ওর হাসপাতালের সমস্ত কফিনের সাপ্লাই ও দেয় । কফিনের কাঠ যায় আমার এই কাঠগোলা থেকে । আজকাল আবার বায়ো ডিগ্রেডেবেল কফিন চায় অনেকে । অনেকে তাদের প্রিয়জনের শেষ শয্যায় ডিজাইনার কফিন দিতে চায় । কাস্টম মেড কফিন । তাতে সেই মানুষটির মনের কথা , প্রিয় কোটস্ , ছবি , মনের মানুষের ছবি সব আঁকা বা খোদাই করা থাকবে ।

দিদির এখনও ইচ্ছে আছে, একদিন অনেক টাকা হয়ে গেলে বিদেশ থেকে সুপার- স্পেশালাইজেশান করে আসবে । ও একজন ফাইন সার্জেন ।

ওর আর্দশ ,গ্যামা -নাইফ এর আবিস্কারক Lars Leksell , দিদি ওঁকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে । আমাকে ওঁর ছবিও দেখিয়েছে । ও জন্মেছে ডাক্তার হবার জন্যেই । বিয়ে করেনি । পেশাই ওর জীবন ।

ক্ষণিকের কুমতলবে হয়ত ওর জীবনটা তলিয়ে যেতো কিন্তু নিজের ইনার ভয়েসকে প্রস্ফুটিত হতে দিলো । তাই বুঝি ফিরে এলো আবার সৎ পথে ।

যারা ওকে উইল করে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলো, সেগুলো ও ক্লিনিকের নামে করে দিয়ে এসেছে, দেশে ফেরার সময় । আমার দিদির নাম ডা:সুরভি মান্না । লোকে ডাকে সুর্ভি বলে । ও যা দেখেছে তা সত্যি হোক , কল্পনা হোক ,যাইহোক তা থেকে ও একটা শিক্ষা পেয়েছে এবং তা গ্রহণ করেছে খোলা মনে যার জন্য আজ আবার নতুন পথে অবগাহন করতে পেরেছে । তলিয়ে যায়নি । এটাই আমার কাছে শিক্ষণীয় । যা দেখেছে দিদি তা প্রমাণ করা অসম্ভব । ওটা মেটাফোর , মিথকথন , বিমূর্ততা । কিন্তু বিবেকে, যা আন্দোলন হয়েছে ঐ মন ক্যামেরার ফিল্ম দেখে সেটা চূড়ান্ত বাস্তব ।

আমি ক্ষমা ও সহনশীলতা যা মর্ডান সমাজে বিরল তা একটু একটু করে নিজের চেতনায় ইনজেক্ট করতে শুরু করেছি । ভীম বা ভীমা ছাড়া এখানে কেউ জানেনা যে আমি বেআইনি ভাবে শিকার করে রক্তপান করতাম ও দেহাংশ খেতাম । আমি দিদিকেও বলিনি । কিন্তু নিজেকে শুধরে নিয়েছি । বুঝেছি ,যে দেহের শক্তি বাড়িয়ে বিশেষ লাভ নেই । মহাবিশ্ব যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে , সেই কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শক্তির খনি । খনি আমাদের মন । মনোবল ।

বাইরে থেকে তাকে আমদানি করতে যাওয়া একপ্রকার মুর্খামি ।

আর আমি এখন বর্তমানে বাঁচতে শিখেছি । প্রেজেন্টে । তাতেই অনেক আনন্দ । অতীত বদলানো যায়না । আর প্রেজেন্ট

ভালোভাবে কাটালে ভবিষ্যৎও সুন্দর হয় । কাজেই আমি, সুলেখা মান্না এখন শুধুই রোজ
কাঠচেরাই করি ও প্রেজেন্টে বাঁচি ।

এই আজব কাহিনী শুনতে শুনতে কুহক , ছন্দস্ , মঘা ও রোশনির মনে হল সুলেখা ও সুরভি মান্না দুই বোন নয় । যেন অশ্লেষা ও ভরণী নেমে এসেছে আকাশ থেকে আজ । নিয়েছে মানবী রূপ । এই জটিল জগতের ভ্রষ্ট সময়ে ,ভঙ্গুর সমাজে -- ওদের পথ দেখাবার জন্যে ।

মোম পাশা

মোমপাশা শুনলে মনে হয় মোঁপাসা । তাই না ? মোমপাশা কিন্তু একটি রাজ্যের নাম । পাহাড়ের শ্রেণীর ওপরে একটি রাজ্য । সেখানে মোমের কেল্লা আছে । কেল্লার ভেতরে মোমের ঘরবাড়ি ও মোমের মানুষ বিরাজমান । কেল্লার মধ্যেই একটু দূরে -ক্ষীরের পাহাড় চূড়ায় একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা । ওরা বলে দেবতা । নাম কুমারসেন । পাহাড়ের নিচে একটি আগ্নেয়গিরি । ঘুমন্ত । ছাইচাপা আগুন যেন! সেই অগ্নি-স্রোত যেন প্রকাশিত না হয় , লাভা এসে যেন গ্রাস না করে এখানকার লোকভূমি তাই বুঝি পুজিত হন কুমারসেন । তাঁর কোনো আকৃতি নেই । শুধু বহ্নিশিখা মাত্র । এই স্বয়ম্ভূ শিখা, কিছু পোড়াতে জানেনা । শুধু উজ্জ্বল দীপের মতন আলো দেয় । তার রং নীল ও বেগুনি ।

পন্ডিতেরা বলেন : কোল্ড ফ্লেম ।

এখানকার মানুষ-- ১৫বছর বয়স অবধি কেবল মানুষ থাকে । ১৬ বছর হলে তার লিঙ্গ সৃষ্টি হয় । তার আগে জননেন্দ্রিয় বলে বিশেষ কিছু থাকে না । ছিদ্রযুক্ত মানুষ দেখা যায় । দেহ মোমের । নরম ও মসৃণ ।

যখন লিঙ্গ পায় -সেইসময় মহা সমারোহে উৎসব করে মানুষকে জানানো হয় যে এইবার আমার সন্তান মানুষ হল । মেয়ে অথবা ছেলে দুটৈ সমান আদৃত । এই সমাজে নপুংসক নেই ।

শিবাঙ্গী নামক এক রমণী, ভারতের এক শহরে থাকতো । উনি একবার নিজ লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলেন, বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে । উনি ডাইভোর্সি ছিলেন । সমাজে, নিজের প্রেজেন্স বাড়ানোর জন্য উনি ভেবে দেখেন যে পুরুষ হলেই ভালো । তাই লিঙ্গ পাল্টে

নেন । পেশায় ছিলেন বিরাট শপিংমলের ম্যানেজার । লিঙ্গ বদলে যাওয়াতে সুবিধে হল । অনেক কর্মী এখন বেশি মান্য করে । পুরুষদের সাথে এখন অনেক খোলামেলা ভাবে মিশতে পারেন, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে , নো-স্মোকিং আর শিবাঙ্গীর জীবন দর্শন নয় । তবে অফিস বদলাতে হয়েছে । অন্য শহরে চলে গেছেন । অন্য ব্রাঞ্চে ।

মুস্কিল হয়েছে তার একমাত্র সন্তান অগাস্টের । আগে মা বলে সম্বোধন করতো । এখন বাবা বলে । মা শিবাঙ্গী অবশ্য বলেন : তোমার বাবার অভাব পূরণ করতে আমি এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।

অগাস্ট অর্থাৎ অগাস্টিনের এগুলি মোটেই ভালোলাগে না । যাকে মা বলে জেনে এসেছে , ভালোবেসে এসেছে , স্নেহ মমতা পেয়েছে সে হঠাৎ বাবা কি করে হয়ে যায় ? আজকাল ইস্কুলে যেতেও ইচ্ছে করেনা । বিচ্ছু সব বন্ধুরা, ওকে দলবল নিয়ে ক্ষ্যাপায় : ওর মা এখন ওর বাবা হয়ে গেছে রে ! ওর মাম্ প্লাস পাপা-- মাম্পাপা এখন জু-তে থাকে । খাঁচায় , ইটির পাশেই ।

ওর বন্ধু টায়রা ও তার বোন সায়রা ১৫বছর অবধি লিঙ্গহীন ছিলো । তারপর একদিন টায়রা ছেলে আর সায়রা মেয়ে হয়ে গেলো । দূরত্ব বেড়ে গেলো । ওদের দেশে নাকি এইরকমই হয় । রাজ্যের নাম মোমপাশা । জায়গাটা এতই সুন্দর ও মনোরম যে মোমসুন্দর বলেও অভিহিত করা যায় । আর এটা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়না । কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলে এই দেশে পৌঁছে যাওয়া যায় । তাই এই বিশ্বকে মানুষ বলে : ফিফথ্ ডায়মেনশান ।

অগাস্ট ওর বন্ধু টায়রার সাথে এসেছে--মোমপাশা নামক এই আজব পাহাড়িয়া প্রদেশে । মোমের কেল্লা । মোমের শহর । মোমের মানুষ । চক্চকে দেহ । কোমল অবয়ব । চোখ নাক মুখ সব মসৃণ

। যেন ছাঁচে ঢালা । এদের মাথার চুলগুলি রূপার কেশরের মতন । আর গায়ে লোম বা ভ্রূ ইত্যাদিতে চুলের পরশ কম ।

অগাস্ট এখানে আছে । ও মোম মানুষ মরে গেলে, তাদের পোড়াতে সাহায্য করে । জায়গাটিকে বলা হয়ঃ মোম চুল্‌হা ।

পোড়ানোর ব্যবস্থাও খুব সুন্দর । একটা মোমবাতি থেকে মায়াবী সবুজ আলো এসে মোমের দেহ ঢেকে ফেলে । তারপর সমস্ত মোম গলে একটি সরু ঝর্ণা দিয়ে,এক মোম নদী আছে, সেখানে বয়ে চলে যায় । মোমনদী পাহাড় থেকে তরলিত চন্দ্রিকা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মহাশুন্যে । সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে কেউ জানেনা !

অগাস্ট আর বাড়ি যায়না । এখানেই থাকে দিবারাত্রি । মৃতদেহ গোনে, দ্যাখে । পোড়ায় । এই তো জীবন -- ক্ষণস্থায়ী । পৃথিবীতেই হোক অথবা ফিফথ্‌ ডায়মেনশানে । যা শুরু হয় তা শেষও হয় । জন্মিলে মরিতে হবে , অমর কে কোথা কবে ? চিরস্থির কবে নীর , হায়রে জীবন নদে ? আমরা সবাই জানি এই বিখ্যাত পদাবলী ।

অগাস্টের মা শিবাঙ্গী, এখন ওর বাবা শিব । নিজ জন্মদাতাকে বড় হয়ে আর দেখেনি । মনেও পড়েনা । কাজেই ওর জীবন থেকে ওর বায়োলজিক্যাল বাবার বিয়োজন হয়ে গেছে । শিবকেই বাবা মনে করে নিতে হবে । যা ওর পক্ষে সম্ভব না । এরকম অদ্ভুত একটা সম্পর্কের বোঝা সে বইতে পারবে না । তাই চলে এসেছে । শিবাঙ্গীও আর ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেননা । বলেন : তুমি মৃতদেহ পোড়াও । মড়ার সাথে থাকো । তুমি অপদেবতা ও প্রেতাআদের জগতে বিচরণ করো । তুমি শয়তানের দূত । দানবের সংরাগ । তুমি অমানুষ, তুমি ভয়ানক । বাড়িতে তোমায় জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় । কারণ মানুষের ক্ষতি করা হবে !

অগাস্ট বলে : মাই মাদার ইজ অ্যান অ্যাসহোল ।

বলে কি আমাকে যে বাড়িতে এসো না , লোকের ক্ষতি হবে তাতে- হোয়াট দা ফাক্ ?

অগাস্ট তাই আজকাল একমনে, মোম মানুষের- মোমনদীতে অন্তিম স্নান দেখে । মোম দিয়ে তৈরি । মোমেই শেষ হয়ে যায় । তাহলে এতদিন যে নড়ে চড়ে বেড়ায় সে তাহলে কে? কোথায় সে এখন ? ক্ষণিকের এই মায়াবী জগতে সে কেন আসে ? মৃত্যুর পরে কি আবার প্রিয়জনেদের সাথে দেখা হয় ? চেনা যায় ? যাদের সাথে এত মাখামাখি , এত টান তাদের কি মরণের পরে নতুন শরীরে দেখে সব কিছু মনে পড়ে যায় ? মোমের দেশে জাতিস্মর হয় ? এইসব গভীর প্রশ্ন আজকাল কিশোরটিকে বড্ড ভাবায় । ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন । ও বাড়িতেই অনাহুত । কাজেই মোমের শিখার পাশে বসে বসে কেটে যায় এক একটা তিথি ।

এদের রসুই ঘরে, উনুনের বিশেষ আলো এসে রন্ধনে সাহায্য করে । সাধারণতঃ এরা দিনে দুবার খায় । রেশমি রুটি , সুস্বাদু ঝাঁঝালো আচার যাকে ওরা বলেঃ ঝাঁঝাঁ , নানান রঙীন সব সবজি দেওয়া একটি থকথকে ডাল ।

ডালের রং নীল । ডাল শস্যের নাম হল ফেমিপন্‌ঘট আর থকথকে রান্না ডালের নাম হল গিয়ে : হোপি ।রাতে মধু, ফলমূল খেয়ে থাকে । ফলকে এরা বলে : গিরোত্রি, মধুকে বলে মাদ্‌ভী । সাদা ধবধবে ছানা এদের ডেলিকেসি , বলা হয় সুহিফ্রা । ভীষণ নরম এই ছানা দুধ থেকে তৈরি হয়না । ছানা হিসেবেই পাওয়া যায় ওদের দেশের এক বিশেষ গাছ --- দুধপুলি ডালের ভেতর থেকে । ডাল কেটে ফেললে ভেতরে ছানা পাওয়া যায়, যেমন হাড়ের ভেতরে মজ্জা থাকে সেরকম ।

রুটি ইত্যাদি রান্না হয়ে চুল্‌হায় । আলোর সাহায্য নিয়ে । আমাদের মাইক্রো ওয়েভের মতন । তবে এই আলো প্রাকৃতিক । ওদের

দেশের সূর্য থেকে নিস্কাশিত হয় । উনুন জ্বালাতে গেলে মন্ত্র বলতে হয় ।

ওখানে সূর্যের তাপ অনেক কম । আলো, ভোরের আলোর মতন শীতল ও মিষ্টি ।

ওদের ফিফথ্ ডায়মেনশানে কেউ অসুস্থ হলে তাকে আলো দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয় । ওরা আলোর জীব। ওপরে মোমের খোলস । বিভিন্ন বিকিরণের সাহায্যে, ওদের অন্তরের আলোকে আবার সজীব করে দিলে দেহ সুস্থ যায় । কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই ওরা মনের শান্তি ধরে রাখতে পারে । অতীত নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না । ভবিষ্যৎ বলে এখানে কিছু নেই । এখানে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে ।

পাখিগুলো অপূর্ব সুরে গেয়ে চলেছে । কারো কোনো ব্যস্ততা নেই ।

যারা জ্ঞানীগুণী তারা দেখতে ঢেউ এর মতন । কেউ ঘূর্ণী কেউবা স্রোত আবার কেউ রেখাচিত্র তো কেউ বিন্দুর সমারোহ । কেউ স্পন্দিত হচ্ছেন আলোর শঙ্খ আকৃতি নিয়ে । এখানে মোমমানুষ তিন ধরণের । সাধারণ মানুষ রঙীন মোমের । নানান রং । কেউ লাল , কেউ সোনালী, কেউ হলুদ বা সবুজ । এরপর আছে আবেগ মানুষ আর চিন্তা মানুষ । আবেগ মানুষ রূপালী । অনেকটাই স্বচ্ছ । চকচকে দেহ । আর চিন্তা মানুষ ঐ ঢেউ এর আকারে রয়েছে ।

এইসব নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে এখানে ফ্লোরেন্স ভট্টাচার্য । ও জিন বিশেষজ্ঞ । মানুষের জিন নিয়ে কাজ করে । জিন ম্যাপিং করে । নানান শ্রেণীর মানুষের জিন পরীক্ষা করে বার করে কে কেমন। কি কি রোগ হতে পারে । কার বুদ্ধি , মেধা কি ধরণের হবে , শাণিত , ধারালো নাকি নিতান্তই ভোঁতা ?

অগাস্টের কাছে এই বিশ্বের কথা শুনে ধ্যানস্থ হয়ে এসেছে দেখতে এদের জিনগুলি কেমন । ওর বন্ধু মিনার্ভা ব্রাউন নিজের বিভিন্ন জিন পরীক্ষা করে দেখেছে যে সে নানান ক্যান্সার ও আজব

অসুখের শিকার হতে পারে , পরিবারের ঐ বিশেষ জিন বহন করছে বলে । তাই এক এক করে ব্রেস্ট দুটি বাদ পড়েছে । বাদ পড়েছে গর্ভাশয় , অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি । ভয়ে । কর্কটরোগের ভয়ে । মরার ভয়ে ।

শেষে দেখা গেলো মিনার্ভা একটি গাড়ি দূর্ঘটনায়, কোমাতে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে এক হাসপাতালে , লাইফ সাপোর্ট নিয়ে আজ ছয়মাস । বাঁচবে কিনা কেউ জানেনা । এরপরেও জিন ম্যাপিং করে লাভ আছে কিছু ? দূর্ঘটনার জিনটা কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজলে ?

মোমের মানুষদের যে লিঙ্গ বিভ্রাট দেখা দেয় তাকে ফ্লোরেন্সের শাস্ত্র নাম দিয়েছে --5-alpha-reductase deficiency....

পৃথিবীতে এইরকম কিছু স্থান আছে, যেখানে এইসব মানুষ আছেন । কিন্তু মোমপাশাতে সবাই এরকম। এখানে এরা সবাই ১৫বছরের পরে লিঙ্গ পায় , এরাই স্বাভাবিক এখানে। ফ্লোরেন্সের ফাইভ আল্‌ফা রিডাক্‌টেজ ডেফিসিয়েন্সি রোগের মতন জিনের বৈকল্যে কেউ ভোগে না । গালভরা নাম দিয়েছে বটে মানুষ! মহাবিশ্বের বিশালত্বের কাছে মাথা না নুইয়ে , তাকে জয় করার প্রয়াসে শব্দের মূর্চ্ছনায় ভরে দিয়েছে কোষগহ্বর । কোষ নয় তো কি ? সবাই তো কোষ । কোষের মাঝেই লুকিয়ে আনন্দ , কোষের মাঝেই ব্যাথা । কোষে কোষেই ঠোকাঠুকি , নাম তার অসংখ্য প্রথা । আর কোষের গভীর গোপনে রহস্যময় -জিন । নাহ্ ! এদের কোনো জিন-বৈকল্য নেই । এরাই নর্মাল, মোমমানুষ । মোমের মায়াজগতে, এরাই কোমললতা অথবা গহর মিঁয়া ।

যা পৃথিবীতে অস্বাভাবিক, ঘৃণ্য তা অন্য কোথাও আদরনীয় । পুরো বিশ্ব ব্রহ্মান্ড একটি রহস্যময় গহ্বর । এখানে পুরোটাই তরল সুরের খেলা । লিকুইড মিউজিক-কেউ স্বাভাবিক নয়, কেউ অস্বাভাবিকও নয়, শুধু ডায়মেশানটা বদলে নিতে হবে, চিন্তার ছাঁচ ভেঙে নতুন করে তৈরি করলে দেখা যাবে যা এতদিন ভুল ভেবেছি তা আসলে আমারই বোঝার ভুল ।

চিত্র, বস্তু , রং, গন্ধের বাইরে যে জগৎ -তা অন্তর্মুখী ও অসূর্যম্পশ্যা । সেখানে শুধু আলোর মালা । আলো বোঝে আঁধারের গুরুত্ব । তাই বুঝি মোমের দেশ মোমপাশায় সবাই সমান । কেউ ভঙ্গুর জিন নিয়ে , অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে- সারাটা জীবন নিজের অদেখা ভাগ্য অথবা ইউনিভার্সকে দোষারোপ করেনা । কেউ এখানে বিষাদ মানুষ নয়, মোমের দেশ , আনন্দলোক । তাই ওরা ওদের জগতের বাসিন্দাদের অন্তরে উঁকি দেয় । এতেই বেশ আছে ওরা সবাই । তাই কেউ বিচিত্র

5-alpha-reductase deficiency অসুখে আক্রান্ত নয় । সবাই সুখে -এখানে ।কেউ অসুখে নয় ।

তুমি কি দেখবে সেটা তোমার সংস্কার তৈরি করে । তাই কেউ কেউ মহামানব হন , মানুষের দোষত্রুটি না খুঁজে সবার পজিটিভ দেখেন । তাই সমাজ ও দশের জন্য কাজ করে যেতে পারেন । আবার কেউ অন্যের অসুখ , ঘৃণপোকা ,পচন খুঁচিয়ে বার করে ,দগ্ধ ঘায়ে সুগন্ধী লেবুপাতার স্পর্শ না দিয়ে লেবুর অম্ল ও লবণের প্রলেপ দিয়েই সুখী হয় । যে যা দেখে শেষপর্যন্ত সেও তাতে গিয়েই মেশে ।দেখতে দেখতে, মানুষ বিন্দাস্ হতে হতে, শেষমেশ বানর বনে যায় । বানর কিন্তু মানুষ হতে চায়না । ওরা নিজেদের সন্তানকে আদর্শ হিসেবে দেখায় নক্ষত্রদের । পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীবকে অন্য প্রজাতিরা ভয় পায় । অসম্ভব ভয় পায় -তাদের দূর্বুদ্ধির কারণে । আজকাল মানুষ ওদের ঘরবাড়ি তচনচ করে , ওদের ধরে এনেই ক্ষান্ত নয় , জিনের বৈকল্য ঘটিয়ে ওদের বদলে দেয় । কিন্তু মানুষ নিজেকে বদলায় না । কেউ তাদের আক্রমণ করলে বলে সে জানোয়ার । অথচ আত্ম -বিশ্লেষণে কেউ যায়না । ভাবে না অন্যের জিনের পরিবর্তন করার অধিকার মানুষকে কে দিয়েছে ? পুরো জীবজগৎ যে একে অপরের ওপর নানানভাবে নির্ভরশীল তাও মানুষ বুদ্ধির ছটায় ভুলে যায় ।

দৃষ্টিকোণে মাধুর্য্য ও মমত্বের কোটিং থাকলে বোঝা যায় যে খোলস দিয়ে কেউ মানুষ অথবা পশু বা মোমমানুষ হয় না । খোলস হল ইউজ অ্যান্ড থ্রো । শাঁসটা, কালের গহ্বরে লুকিয়ে পড়ে । আবার নতুন প্যাকেজিং , পশু অথবা মোম মানুষের প্যাকেট । শাঁস একই থাকে । এই বিভাগ হল ইসোটেরিক - বিদেশী নাম ।

নাম আমরা দিতে জানি বটে । সবকিছুর নাম দিয়ে ফেলি । যেমন আমি এই কথামালার নাম দিয়ে ফেললাম : ময়ূরকণ্ঠী বল্কল ।

এগুলো ইউনিভার্সের অবোধ সাইড ।

মানুষ, মুখর হয় নীরবতায় অবগাহন করলে । এটাও অবোধ সাইড ।

এই যে আমি বইটা লিখলাম তাতে কি হল ? কিছু কথার ফুলঝুরি , ব্যস্ । কিছু চরিত্রের চরিত্র হনন । কিছু চেতনার জয়জয়কার ।

কিছু শিখলাম কি লিখতে গিয়ে ?

কুব্জা তো বুঝেছে নিজ সীমারেখার স্খলন । দেখেছে গলিত, পাশবিক মনের প্রতিফলন । তবুও সে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চায় ।

সেটা কি সম্ভব ? লজিক্যালি ? আমরা আজকাল সবাই লজিকের পূজারী । আমাদের দেবতা লজিক ঠাকুর । ধর্ম -বিজ্ঞান । সেই ধর্মের স্মরণ নিয়ে বোঝা যায় যে কুব্জার পদস্খলন হলেও আবার সে নিজের অন্তরের দৈবরূপকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম । কারণ শাঁসটা বদলায় না । শুধু দূষণের দরুণ কখনো কখনো ওতে তেজস্ক্রিয়তার পরশ লাগে । কিন্তু রেডিও অ্যাকটিভ ডিকে কখন হবে তার হিসেব কারো কাছে নেই ।

সমষ্টিগতভাবে পরমাণুর ক্ষেত্রে যদিও বিজ্ঞান-ধর্মে এই সম্বন্ধে বলা যায়

কিন্তু প্রতিটি পরমাণুর কথা বলা একটু মুস্কিল । শাঁস যদি পরমাণু হয় তাহলেও ডিকে হবে কিন্তু কবে কেউ জানেনা ।

সিম্পেল লজিক । আজ যারা পাগল তাদেরই কাল মানুষ বলে জিনিয়াস । যারা দস্যু রত্নাকর তারা ঋষি বাল্মিকী আর যারা কুচকুচে কালো মানুষ , যাদের গায়ে হাত ঘষে ঘষে দেখে রং টং মেখে এসেছে কিনা তারাই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা বদলে দিলে আবার হয়ে উঠছে এক একটি বিশ্ব সুন্দরী । এও লজিক আর দৃষ্টিকোণের ব্যাপার । কুব্জা মন্থরা কি হয়ে উঠবে এক মহিয়সী ? পুরাণের গন্ডী ছাড়িয়ে চলে আসবে ইতিহাসের পাতায় । স্মরণ করবে মানবজাতি তাকে এই অভিনব উপকারের জন্য? যেই গভীর কটি সমস্যার ওপরে দাঁড়িয়ে আজ টালমাটাল মানব সভ্যতা, সেই সমস্যার চমকপ্রদ সমাধান ।

পুরাণও একসময় ইতিহাস ছিলো । ইতিহাস কাছেরগুলি । পুরাণ প্রাচীনগুলি । কাজেই মন্থরা এবার পুরাণ থেকে ইতিহাসের দিকে এগোচ্ছে । ফল কি হবে আমরা জানিনা । অপেক্ষা করতে হবে ।

গল্পের ঝুলি শেষ । নটে গাছটি মুড়ালো । ভ্রামরি ও ভদ্রিকা বসে আছে ফলের আশায় । ময়ূরকন্ঠী বল্কল থেকে দুনিয়া কি পাবে? শোষণ করে নেবে সমস্ত রেডিয়েশান ও দূষণ নাকি দেবে মহার্ঘ্য তেল -পেট্রল যার ওপরে দাঁড়িয়ে আধুনিক সভ্যতা !

রেজাল্ট পেতে হলে হিসেব করতে হবে কার সবচেয়ে বেশি গল্প পাঠকের সত্যি সত্যি মন ছুঁয়েছে । পিঠ চাপড়া -চাপড়ি অসুখে পড়ে সহজলভ্য মেডেল নয়,আধুনিক সমাজের তথাকথিত পুরস্কার প্রাপকদের মতন । যেখানে প্রতিভাকে ছেড়ে পুরস্কৃত করা হয় গ্রস মানুষদের । পুরস্কারের প্রকৃত অর্থ ভুলে আজ এগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক কতগুলি ধাতুর চাক্তি । কাজেই সময় লাগবে । পাঠক সত্যি সত্যি মনের কথা খুলে বলবেন । সময় দিতে হবে । সময়ে সব হবে । অপেক্ষা, ধৈর্য্য । আচ্ছা ,

কেউ ধৈর্য্য ও অপেক্ষার সংরক্ষণের কথা বলে ? আধুনিক দুনিয়ায় এইদুটো তো পুরাণ হয়ে গেছে। ইতিহাসও নয়।

কুব্জা মন্থরা তাই বেড়াতে বেরিয়েছে এই সুযোগে। দুটি জায়গা দেখেছে। ভারতের রাজদরবার পুরাতন নগর গোয়ালিওর আর নায়াগ্রা ফলস্। দুটে মন্দ লেগেছে। নায়াগ্রা ফলস্ শহরের মাঝে। প্রাকৃতিক ব্যাপারটি নেই। এতবড় একটি ঝর্ণা অথচ চারপাশে কনক্রিটের ঘরবাড়ি, টাওয়ার --মন্থরার হৃদয় মন্থন করতে পারেনি। আর গোয়ালিওর শহরে প্রাসাদ আছে বটে তবে অসম্ভব দৃষ্টিকটু।

ওখানে তানসেনের সমাধিও নড়বড়ে। কোনো গুরুত্ব বোধকরি কেউ আর দেয়না। সেইসময়কার এত বড় গায়ককে। এটাই বোধহয় বুঝিয়ে দেয় যে জীবনের মতন প্রতিভাও ক্ষণস্থায়ী। একদিন সব উড়ে যাবে আকাশে। কেউ আর মনে রাখবে না।

আমরা যে কোনো কিছুকেই সম্মান দিইনা আর ,কোনো নিয়ম মানিনা সেটাই কুব্জা মন্থরাকে দু:খ দিয়েছে। সে নিজে খারাপ কাজ করে প্রায়শ্চিত্য করতে এসেছে মর্ত্যে। কিন্তু কাদের জন্যে ? তারা সবাই কি প্রতিনিয়ত ইগো দ্বারা চালিত হয়ে বিশ্ব চরাচরকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে না ? মন্থরা ভগ্ন হৃদয়ে চেয়ে আছে গোয়ালিয়রের সর্ষেক্ষেতের দিকে। অপরূপ সোনারঙা ক্ষেতের পাশেই কদর্য গোবরের ঢিপি। সবুজ পালং শাকের চাষ হয়েছে, সুন্দর নয়নাভিরাম। সেই শাকগুলি তুলে কেমিক্যালে চুবিয়ে রং বাড়ানো হচ্ছে আরো টাটকা দেখাবার জন্যে।

মন্থরা দেখছে মানুষ আদিমতাকে পুরোপুরি ভুলে গেছে। শিকড় উপড়ে ফেললে কি গাছে বাঁচে ?

ছুট্টে যাচ্ছে মন্থরা তাই ,মন্থরগতিতে আর নয় , সঙ্গীত-সম্রাট তানসেনের সমাধিতে। চীৎকার করে বলছে : শুনেছি তুমি গান

গেয়ে বৃষ্টি ও আগুন জ্বালাতে পারতে । এবার এমন গান করো দেখি যাতে বেঁচে যায় এই ক্ষয়প্রাপ্ত , নিরস মানবসভ্যতা ।

যার ওপরে মখমলের প্রলেপ আছে ,আছে চোখ ধাঁধানো জ্যোতি কিন্তু অন্তরটা সারশুন্য ,পারবে ট্যান (তানসেনকে এই নামেই ডাকে মন্থরা, আমাদের মতন শর্টফর্মে) সেই গান গাইতে যা মানবজীবনে প্রাণ সঞ্চার করবে ? ওরা মেশিন থেকে মানুষ হবে , হৃদপিন্ডটা আবার স্পন্দিত হবে লাবডুব লাবডুব ছন্দে । প্রতিটি বুকে আর বসানো থাকবে না পেসমেকার । এত পেসমেকার বলেই বুঝি আজ সবাই মেশিন -- ভুলে গেছে হৃদয়ের আলোড়ন , কুসুম রং ও ফুলের পরশ ।

তিতলি নক্সা

টেট্‌লি কেকোভিচের বাংলা নামকরণ করেছে মুনিয়া মিশ্র, তিতলি । মুনিয়া মিশ্রের বাস ডেলাইনা নামক একটি বিশাল দেশে যেটি আদতে একটি বিরাট দ্বীপ ।

মুনিয়া পেশায় ধোপা । ধোপানি বলা আরো ভালো । ধোবি ঘাট ওর বাড়ির পেছনটা । সেখানে আরো একটি কাজ চলে । বেবী সিটিং এর কাজ । একসাথে দুটি কাজ করে মুনিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা । চুনিয়া , লিলিয়া , ডালিয়া , বিন্দিয়া , পাপিয়া ও জিনিয়া । নারী দ্বারা চালিত দুটি কর্মক্ষেত্র । টেট্‌লি থাকেন কাছেই । বনের ভেতরে । আসলে ওদের শহরের এইদিকটা বনজঙ্গলে ভরা । নাম উইল্ডারনেস ।

টেট্‌লিকে ; তিতলি বলে মুনিয়া । ভদ্রমহিলা একা থাকেন দুটি হেল্প ডগ নিয়ে । ওঁর গাত্রবর্ণ খুব অদ্ভুত । পুরো তামাটে । তাম্রবর্ণ । আর সারা গা থেকে কুচি কুচি তামা ঝরে পড়ে । ল্যাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তা সত্যি তামা । খনিজ তামা । ধাতু তামা- সেই তামা । ঝুরঝুর করে পড়ে গা থেকে । তামাঝুরি ।

ভদ্রমহিলা একা থাকেন কারণ কেউ আসেনা ওঁর কাছে ।

মুনিয়া দেখে উনি একা বনে ঘোরেন । আবার বাংলোতে ঢুকে যান । একা একা বাগানে বসে চা পা করেন । কাগজ পড়েন ।

একদিন মুনিয়া ওর বাড়িতে হানা দেয় । বিনা আমন্ত্রণে । বলে : আমি ধোবি । আপনার কিছু ধুতে হবে ? আমি পাশেই থাকি ,

কাজ করি । আমার একটি টিম আছে । আপনাকে রোজ একা একা হাঁটতে দেখি তাই আলাপ করতে এলাম ।

ভদ্রমহিলা খুবই বিনয়ী । কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে প্রায় শোনাই যায়না ! বলেন : আমি একা আর কোথায় দুজন দস্যু আছে দেখোনি বুঝি ? ফিগো আর গিগো ।

ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে নাহলে আজকাল তো কেউই আসেনা । আগে এই বাংলোতে সবসময় লোক থাকতো । এই বনের রাস্তায় সরকারকে স্ট্রিট সিগন্যাল বসাতে হয়েছিলো এতো ভীড় হত সেইসব দিনে আমার বাড়িতে । আজ আর কেউ আসেনা । ফিগো আর গিগোকে নিয়েই আমার সংসার ।

মুনিয়া বুঝলো কোনো কারণে ভদ্রমহিলা একাকীত্বে ভুগছেন।হয়ত আত্মীয় পরিজন ওঁকে ত্যাগ করেছে । মর্ডান সোসাইটির এই তো হাল । সম্পর্ক রাখা যাচ্ছে না , সম্পর্কে কখন যে ঘূণ ধরছে কেউ টের পাচ্ছেনা । কাছের মানুষ হয়ে যাচ্ছে পরদেশী । পরদেশী টেনে নিচ্ছে বুকে, বিপদে আপদে । সেইরকম কিছুই হয়ত এঁর সাথেও হয়েছে !

টেট্‌লি বা তিতলি, মুনিয়াকে সবিনয়ে জানালেন যে ওঁর কোনো কাপড় ধোবার বা ইস্ত্রি করার নেই । উনি নিজেই সব করেন ।

তামাটে রং-টা ভীষণ সত্যি । চকচক করছে সারা দেহ । মুনিয়া ভাবলো যে হয়ত ওঁর কোনো স্কিন ডিজিজ হয়েছে ।

এরপর থেকে ও প্রায়ই যাতায়াত শুরু করলো । ধীরে ধীরে রহস্যের সমাধান হল । একদিন সবার নয়নের মণি, যাঁর স্পর্শ নেশায় ছুটেছুটে আসতো দূরদূরান্ত থেকে মানুষ , উনি ছিলেন

এক মহাকাশচারী । এইদেশ ,ডেলাইনা থেকে প্রথম স্পেসে যান একজন মহিলা । উনিই এই ভদ্রমহিলা । টেট্‌লি কেকোভিচ । পূর্বপুরুষ ডেলাইনা দেশে এসে বসবাস শুরু করেন হিটলারের উৎপাতের সময় থেকে । একটি ভাঙা জাহাজে করে এসেছিলেন সবাই । এখানে এসে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, এই হেরে যাওয়া মানুষগুলি- লোকের কটাক্ষ সহ্য করতে না পেরে সমস্তকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেন সমুদ্রে । সাগর তো কিছু নেয়্‌না ! কাজেই সব ভেসে আসে চরায় । বালুকাবেলায় পড়ে চকচক করে, যেন কেঁদে ভাসাচ্ছে মালিকের অভাবে ! এটা বাস্তব নাকি শিল্পীর কল্পনা ? মুনিয়া জানেনা ।

--ডেলাইনা একমাত্র দেশ দুনিয়ার ,যারা মহাকাশে প্রথম একজন মহিলাকে পাঠায় । আমি টেট্‌লি কেকোভিচ সেই মহিলা । অথচ আজ আর কেউ মনে রাখেনা । একসময় ভক্তের অত্যাচার থেকে বাঁচতে এই বনে এসে বাড়ি করা । এখানেও লোকে এসে ভীড় করতো । বলেন মৃদু স্বরে তিতলি ।

কিন্তু মহাকাশে কয়েকবার যাবার পড়ে ওঁর চামড়ায় এইধরণের পরিবর্তন আসে । সব তামাটে হয়ে যায় । ঝুর ঝুর করে তামা পড়তে থাকে । তখন লোকে ভয় পেয়ে যায় । আসা বন্ধ করে । কারণ কিসের থেকে এই অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে তা মানব সভ্যতার আওতার বাইরে । তখন থেকে লোকে ওঁকে পরিত্যাগ করতে শুরু করে । উনি ভারতে ঘুরে এসেছেন তাই হয়ত মুনিয়ার সঙ্গে ওর বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় । খুব ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া করছেন । ওখানে দক্ষিণ ভারতে খুব টক্‌ খেয়েছেন । ওরা সবকিছুতে অসম্ভব টক্‌ দেয় । সেখানে ডগ টেম্পেল আছে । সারমেয় পূজিত

হয় । কুকুর মানুষের পরমবন্ধু তো হয়ত তাই । কুকুর, দেবত্ব পেয়ে নাকি ঐ এলাকায় মানুষকে রক্ষা করে ।

আবার কোন উপজাতি নাকি মল খায় । নিজের অথবা অন্যের । অন্ত্রে নানান জীবানু হ্রাস হলে বিভিন্ন ধরণের পৈটিক গোলযোগ দেখা যায় । তখন মল ভক্ষণ করলে সেইসব জীবানু আবার অন্ত্রে প্রবেশ করে ও মানুষ সুস্থতার দিকে পা বাড়ায় । একে শিক্ষিত মানুষ বলে : Fecal bacteriotherapy---

আবার আমরা মিশরের মমির কথা বলি । উনি জানালেন ভারতের হিমালয়ে নাকি লামাদের মমি আছে । সেইসব মমি উনি দেখে এসেছেন । লামাগণ প্রাকৃতিক উপায়ে মমিস্থ হতেন । মিশরের মতন নানা রসায়নের সাহায্যে নয় । বহুদিন ধরে খাদ্যে পরিবর্তন এনে, ধ্যানের মাধ্যমে , দেহকে মজবুত করে এই প্রাকৃতিক মমিতে পরিণত হতেন । আস্তে আস্তে প্রাণ বেরিয়ে যেতো । দেহ রয়ে যেতো অবিকৃত ।

তিতলি, সেইরকম করে ওর স্বামী ও অসুস্থ যমজ পুত্রদের মমিস্থ করেছেন । পাশের ঘরেই আছে একটি গুপ্ত সিঁড়ি । তা দিয়ে নিচে বেসমেন্টে নেমে গেলে ঐ তিন জোড়া মমি দেখা যায় । বসে আছে ।

সঙ্গে হাসপাতালের কাগজ আছে । এরকম নয় যে উনি ওদের খুন করেছেন । চিকিৎসকের দেওয়া ডেথ্ সার্টিফিকেট রয়েছে । শুধু দেহ অবিকৃত আছে ।

স্বামী বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে মমি হন স্বেচ্ছায় । পুত্রগণ একজন ডিপ্রেশানে পড়ে দুবার আত্মহত্যা করতে যায় । তখন মিসেস কেকোভিচ ওকে মমি হবার আহ্বান জানান । ধীরে ধীরে খাদ্যে পরিবর্তন এনে , ধ্যান করে সে মমি হয় ।

অন্য পুত্র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র রেয়ার অসুখে আক্রান্ত হয় । সারা দেহ নীল হয়ে যায় । তখন সেও মমি হয়ে যায় । তিনজনকেই মুনিয়া দেখলো । জ্যান্ত মানুষের মতন তাকিয়ে আছে ।

তিতলি বলেন : আমি এখনও আমার ছেলেদের জন্মদিনে কেক এনে এখানে দিই । বিবাহ-বার্ষিকীতে আনি স্বামীর জন্য ওয়াইন । ওরা এখনও কী ভীষণ জীবন্ত দেখো । কে বলে আমি একা ? লোনলি ? দেখো সবাই এখানে আছেন , প্রিয়জনেরা । সত্যি । যেন তাকিয়ে আছেন মুনিয়ার দিকে । তিতলির সারা শরীর থেকে তামাঝুরি পড়ছে । চকচক করছে বেসমেন্টের আলোবিহীন ঘর । মহাকাশের আলোয় ভরে উঠেছে চরাচর । আর মুনিয়া হারিয়ে গেছে গোয়ায় , এক গীর্জায় দেখা মমির স্মৃতিতে । একটি কফিনে শোয়ানো সেই মমি । আর এই তিনখানা মমি জীবন্ত । গোয়ার সেই পর্তুগীজ গীর্জা লোকে লোকারণ্যে । এখানে কেউ নেই । অথচ এই মমিগুলি যেন জ্যান্ত !

এদের আগলে আছেন এক মহিয়সী যিনি সত্যি সত্যি মহাকাশ ভ্রমণে গেছেন । হয়ত এঁকেও একদিন সরকার মমি করবেন আর সারা মিউজিয়ামে ঝরে পড়বে তামার কুচি । যা কিনা মহাকাশের বিষ অথবা নিছক মেমেন্টো । সেই তামা নিয়ে গবেষণা করবে অনেক মানুষ । তারাও একদিন মমি হবেন । শুধু গ্রন্থের পাতায় ।

এই বোনাস গল্পটা শুনে কুব্জা মন্থরা বললো : আমি একটি বেগুনির দোকান দেবো নায়াগ্রা ফল্‌স্‌ এর পাশে ।

দোকানে অসম্ভব ভীড় হয় । সাহেব , অ্যাফ্রিকান , চীনা, লেবানীজ, ল্যাতিনো সবাই মহাসমারোহে গপাগপ বেগুনি খায় । যতক্ষণ না গল্পের বিচার হচ্ছে ততক্ষণ বেগুনি পাওয়া যাবে । বিচার হয়ে গেলে পেট্রল দেবে অথবা বিকিরণ ও দূষণ শোষণ করবে ময়ুরকণ্ঠী বল্কল । দোকানে খুব ভীড় । সবাই একটুকরো বেগুনি চায় । আসলে কুব্জা দিচ্ছে ফ্রিতে । পাপ লাঘব করতে সেবা করছে । গ্লোবালাইজেশানের যুগে বেগুনি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ

হচ্ছে । সাহেবরা অন্যান্য দেশে ম্যাক-ডোনাল্ডস্ , কে এফ সি খোলে । তাই কুজ্জা ফাটাফাটি বিলাচ্ছে বেগুনি । ফার্স্ট ক্লাস খেতে । কবি জয়ের ভাষায়-

কুজ্জা তোমার সঙ্গে ধূলোবালি কাটাবো জীবন, কুজ্জা তোমার সঙ্গে ফাটাফাটি খাবো ফ্রায়েড বায়েনগন ----(ফিউশান ভাষা)

এগ প্ল্যান্ট , বায়েনগন বা ব্রিনজলের এমন রূপকরণ এইদেশের লোকের কাছে নতুন । আর লোভনীয় তো বটেই । কাজেই সবাই পেট ভরে , মন খুশ করে খাচ্ছে । সেই ফাঁকে পাঠক এবার গল্পের বিচারটা সেরে ফেলুন ! ভ্রামরি না ভদ্রিকা -কে ?-- পেট্রল চাই না বিষমুক্তি ?

কিছু চরিত্র ,গল্প থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিমাত্রিক হয়ে পাঠক/কুজ্জাকে ঘুষ দিতে চায় -তাদের গল্পকে সেরা বাছার জন্যে । কুজ্জা হেসে ওঠে । ফোক্‌লা দাঁতে বলে ---এই তো এক নব রামায়ণ ।